New Edition

ইসলাম ও আধুনিকতা

মরিয়ম জামিলা

ইসলাম ও আধুনিকতা

মরিয়ম জামিলা

অনুবাদ

এ কে এম হানিফ

আহসান পাবলিকেশন

মগবাজার ❖ কাঁটাবন ❖ বাংলাবাজার

ইসলাম ও আধুনিকতা

মরিয়ম জামিলা

অনুবাদ : এ কে এম হানিফ

ISBN : 984-32-1013-6

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া

আহ্‌সান পাবলিকেশন

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০

ফোন-৯৬৭০৬৮৬

পরিমার্জিত সংস্করণ

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০০৩ ঈসায়ী

অগ্রহায়ণ ১৪১০ বাংলা

শাওয়াল ১৪২৪ হিজরী

কম্পোজ

মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আহমদ

আহ্‌সান কম্পিউটার, কাঁটাবন, ঢাকা।

প্রচ্ছদ

এম জি এ আলমগীর

মুদ্রণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

নির্ধারিত মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

ISLAM O ADHUNIKATA Written by **MARIUM ZAMILA**, Translated (into Bengali) by A K M Hanif Publised by Ahsan Publication, Kataban Masjid Campus, Dhaka-1000, Revised Edition December 2003 Net Price Tk 60.00 only. (U.S.$ 2.00)

AP-20/2003

প্রসঙ্গ কথা

'ইসলাম ও আধুনিকতা' বইটি মরিয়ম জামিলার 'ইসলাম এণ্ড মডার্নিজম গ্রন্থের অনুবাদ।

লেখিকা একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান। দেশ, কাল, পাত্র, ভাষা, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে ইসলামের সার্বজনীন শাশ্বত আবেদনে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর নিজ ধর্ম ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করে ১৯৬১ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগে তিনি তাঁর নিজ ধর্ম, ইসলাম এবং সমসাময়িক অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শের তুলনামূলক অধ্যয়ন করেন এবং ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে সমকালীন ইসলামী চিন্তাবিদদের সঙ্গে পত্র বিনিময় করেন। ফলে ইসলাম সম্পর্কে তিনি যে বিশদ জ্ঞান লাভ করেন, এই বই-এর প্রতিটি পাতায় তার ছাপ সুস্পষ্ট।

ইসলামের যে মহান সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে মরিয়ম জামিলা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন, তার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা অপরিসীম। মুসলিম নামধারী ব্যক্তিবর্গ এসবের যে বিকৃতি ঘটাতে চেষ্টিত হয়েছেন, তা দেখে তিনি বড়ই ব্যথিত হয়েছেন। মুসলিম পণ্ডিত ও নেতাদের প্রতি তাঁর কঠোর সমালোচনা এই ব্যথারই বহিঃপ্রকাশ।

মরিয়ম জামিলা তার জীবনের মিশন হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ কারণে তিনি নিজ জন্মভূমি আমেরিকা ও পরিবার পরিজনকে ত্যাগ করে ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানে যান এবং লাহোরের একজন মুসলমানকে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। যা ধর্মান্তরিত মুসলমান, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। কাজের সঙ্গে জীবনের সমন্বয় থাকায় মরিয়ম জামিলার বই-এর আবেদন হৃদয়স্পর্শী। লেখিকার মূল বক্তব্য Either

accept Islam in to to or keep it aside, Islam admits no compromise. এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি ভারত উপমহাদেশ, তুরস্ক ও আরব জগতের মুসলিম নেতা ও পণ্ডিতদের কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। ইসলামের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার কারণে কোন ক্ষেত্রে তাঁর সমালোচনা হয়েছে রূঢ়।

মূল বইটি লিখিত হয়েছে ১৯৬৫ সালে। ইতিমধ্যে পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সেদিকে খেয়াল রেখেই অনুবাদে বই-এর কিছু কিছু অংশ বাদ দেয়া হয়েছে। পারম্পর্য রক্ষার শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে কিছুটা ব্যত্যয় যে ঘটেনি তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

পরিপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে এই বইটি আমার প্রথম অনুবাদ। ১৯৭৬ সালে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে বইটি আরেকবার আগাগোড়া দেখে যেখানে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সংশোধন করে দিয়েছি। আশা করি এ সংস্করণ পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বেশি পাবে।

ইসলামী সাহিত্যের পাঠকদের কাছে মরিয়ম জামিলা অপরিচিতা নন। তবে বাংলা ভাষায় এইটিই তাঁর প্রথম গ্রন্থ। বাংলা ভাষাভাষী পাঠক পাঠিকাদের কাছে মূল বইটির অনুবাদ গ্রন্থটিও সমাদৃত হলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

এ কে এম হানিফ
লালমাটিয়া, ঢাকা
নভেম্বর, ২০০৩

সূচি

আমি কেন মুসলমান হলাম

দশ বৎসর বয়সে ইসলামের প্রতি আমার প্রথম অনুরাগ জন্মে। তখন আমি ইহুদীদের রবিবাসরীয় স্কুলের ছাত্রী। আমি আরব ইহুদীদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ি। ইহুদী পাঠ্যপুস্তক থেকে আমি জানতে পারি যে, ইব্রাহিম (আঃ) আরব ও ইহুদীদের জনক। শত শত বছর পরে মধ্য ইউরোপের খৃষ্টানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ইহুদীরা মুসলমান শাসিত স্পেনে কিভাবে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করে তাও আমাদের পড়ানো হয়। আরব ইসলামী সভ্যতার এই মহানুভবতা হিব্রু সংস্কৃতিকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে নিয়ে পৌছায়। ইহুদীবাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাহেতু আমি মনে করেছিলাম আরব ভাইদের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্যেই ইহুদীরা ফিলিস্তিনে ফিরে যাচ্ছে। একই সঙ্গে আমি এও বিশ্বাস করেছিলাম যে, মধ্যপ্রাচ্যে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার স্বর্ণযুগ সৃষ্টিতে আরব ইহুদীরা পরস্পর সহযোগিতা করবে।

ইহুদীদের ইতিহাস পড়ার প্রতি গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও রবিবাসরীয় স্কুলে আমি মোটেই সুখী ছিলাম না। এই সময় ইহুদীদের ওপর 'নাজি'দের চরম অত্যাচার নেমে আসে। ইউরোপীয় ইহুদী সম্প্রদায়ের একজন হিসেবে আমি নিজেও তার শিকার হয়ে পড়ি। কিন্তু আমি এই ভেবে হতাশ হয়ে পড়ি যে আমার সহপাঠি এবং তাদের অভিভাবক কেউই ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ নয়। ধর্মীয় সমাবেশের সময় শিশুরা প্রার্থনা পুস্তকের রসালো অংশগুলো পাঠ করে হেসে লুটোপুটি খেতো। শিশুরা এতই বেয়াড়া ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল যে, তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং ক্লাস পরিচালনা করা শিক্ষকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বাড়ীতেও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। আমার বড়বোন রবিবাসরীয় স্কুলের ওপর বিরক্ত হয়ে পড়ে। কারণ মা প্রতিদিনই তাকে শয্যা থেকে টেনে উঠাতেন আর এ কারণে প্রতিদিন ঝগড়া এবং কান্নাকাটি না করে সে ওদিকে পা'-ই বাড়াতো না। এরূপ করতে করতে মা

বাবা তার উপর বিরক্ত হয়ে তাকে তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেন। ইহুদীদের ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলোতে ধর্মীয় সমাবেশে যোগদান এবং Yom kippur-এর উপবাস করার পরিবর্তে আমাদের দু'জনকে পারিবারিক বনভোজন এবং অভিজাত রেস্তোঁরায় জাঁকালো অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হতো। যখন আমরা দু'জনে রবিবাসরীয় স্কুলে আমাদের অসহায়তার কথা বাবা মাকে বুঝালাম তখন তারা Ethical culture movement নামে স্রষ্টা সম্পর্কে হতাশ একটি মানবতাবাদী সংস্থায় যোগ দিলেন।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে Felix adler এই নৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্মদাতা। পৌরহিত্য করার জন্য লেখাপড়া করতে গিয়ে Felix adler বুঝতে পারেন যে, অতি প্রাকৃত বা ধর্মতাত্ত্বিক নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি নিষ্ঠা আপেক্ষিক এবং মানব রচিত। একটি মাত্র ধর্মই বিশ্বের জন্যে উপযোগী। এগার বছর বয়স থেকে আমি Ethical culture রবিবাসরীয় স্কুলে প্রতি সপ্তাহে যাতায়াত আরম্ভ করি এবং পনের বছর বয়সে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করা পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখি। এখানে আমি আন্দোলনের ধারণার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় লাভ করি এবং সকল চিরাচরিত ধর্মীয় আচারের প্রতি আমার অবজ্ঞা জন্মে।

বয়সন্ধি পর্যন্ত আমি মানবতাবাদী দর্শনে প্রভাবিত ছিলাম এবং বুদ্ধি পরিপক্ক হওয়ার পর আমি নাস্তিক্যবাদে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারলাম না। আমি আমার জীবন সম্পর্কে নতুন করে অনুসন্ধিৎসু হয়ে পড়লাম। কিছুদিনের জন্যে আমি নিউইয়র্কের 'বাহাই' দলে যোগ দিলাম। মির্জা আহমদ সোহরাব (মৃত্যু-১৯৫৮) নামীয় জনৈক পারসী 'পূর্ব পশ্চিমের পর্যটকদল' নামীয় এই সংগঠনের নেতৃত্ব করছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে 'বাহাই'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল বাহা'-এর তিনি সচিব ছিলেন।

প্রথমতঃ ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভেবে ও মানবজাতির একত্ব প্রচারের কারণে 'বাহাই'-এর প্রতি আমার অনুরাগ জন্মে। কিন্তু আমি এই আদর্শের বাস্তবায়নে তাদের নিদারুণ ব্যর্থতা আবিষ্কার করলাম। এক বছর পর বিরক্ত হয়ে তাদের প্রতি আমার মোহমুক্তি ঘটে। অষ্টাদশ বছর বয়সে ইহুদী যুব সংগঠনের স্থানীয় শাখা Mizrachi Hatzair-র সদস্য হয়ে

যাই। কিন্তু কয়েক মাস পর যখন ইহুদীবাদের সত্যিকার চেহারার (যা আরব ও ইহুদীদের বিরোধের সঞ্চার করেছে এবং পুনর্মিলন অসম্ভব করেছে) সঙ্গে পরিচিত হয়ে হতাশার সঙ্গে যুব সংগঠন ত্যাগ করলাম।

আমার বয়স যখন বিশ এবং আমি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আমার পাঠ্যসূচির এক নৈর্বাচনিক বিষয় ছিল ইহুদী ধর্ম ও ইসলাম (Judaism and Islam)। আমাদের হিব্রু ভাষা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক Rabbi Abraham isaac katsh তার ছাত্রদের বুঝাতে চেষ্টিত হন যে, ইসলামের উৎপত্তি ইহুদী ধর্ম থেকে। তিনি আমাদের পাঠ্য পুস্তকে* কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে কষ্টের সঙ্গে সেগুলোকে ইহুদী সূত্রের বলে প্রমাণের চেষ্টা করেন। যদিও তার প্রধান লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের কাছে ইসলামের উপর ইহুদী ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা, তিনি আমাকে সোজাসুজি তার বিপরীত দিকটি বুঝিয়েছেন। কোরআনে বিস্তৃতভাবে পরকালের যে ধারণা দেয়া হয়েছে আমি তা মেনে নিতে পারলাম না। ফিলিস্তিনের ওপর ইহুদীদের ঐশ্বরিক অধিকারও আমি শিকার করে নিতে পারলাম না। প্রাচীন বাইবেল এবং ইহুদীদের প্রার্থনা বইতে যে খোদার চিত্র অঙ্কিত রয়েছে তা আমার কাছে বিকৃত, অধঃপতিত অনেকটা স্থাবর সম্পত্তির প্রতিভু হিসেবে মনে হয়েছে।

ধর্মের সঙ্গে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মিশ্রণ আধ্যাত্মিকভাবে ইহুদী ধর্মকে এমন দুর্বল করে গিয়েছে যা মোচন করা অসাধ্য বলে আমার মনে হয়েছে। ইহুদী ধর্মের অনমনীয় একলা চলো নীতির কারণেই ইহুদীরা সারা জীবন লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। আমার দৃঢ় ধারণা ইহুদীরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিজ ধর্মে আনার চেষ্টা করলে এমন করুণ পরিণতি কখনো আসতো না। কিছুদিনের মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম ইহুদীবাদ হচ্ছে ইহুদী ধর্মের বর্ণবাদী ও গোত্রীয় নীতির সমন্বয়। এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ। আমি যখন আরও জানলাম যে ইহুদীবাদের নেতাদের অনেকেই পর্যবেক্ষণশীল ইহুদী এবং সম্ভবতঃ ইসরাঈলের মত কোথাও ইহুদী ধর্ম এত গোঁড়া এবং চিরাচরিত

---

* Judaism in Islam, Washington square press New York, 1954 পুনর্মুদ্রণ judaism and The koran A, S, Barnes company New York 1962.

আচার নিষ্ঠা নয়। তখন ইহুদী ধর্মের প্রতি আমার বিশ্বাস আরও শিথিল হয়ে আসলো। যখন আমি দেখলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল ইহুদী নেতারাই ইহুদীবাদের সমর্থক এবং আরব ফিলিস্তিনীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন ও অবিচারের প্রতি নির্বিকার, তখন অন্তরের দিক থেকে আমি আর নিজেকে ইহুদী ভাবতে পারলাম না।

১৯৫৪ সালের নভেম্বরের এক সকালে অধ্যাপক Katsh বক্তৃতার সময় অখণ্ডনীয় যুক্তি দিয়ে বলেন, হযরত মূসা (আ) যে একত্ববাদ প্রচার করেছেন এবং সিনাই পর্বতে তার ওপর যে সব ওহি নাযিল হয়েছে সেগুলো সকল উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে অপরিহার্য। Ethical culture এর মত নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকদের শিক্ষা* অনুযায়ী সকল নৈতিকতা যদি সম্পূর্ণ মানব রচিত হয় তাহলে সময়, পরিস্থিতি এবং আবেগের বশে সেগুলো পরিবর্তন করা যেত। ফলে ব্যক্তি ও সমষ্টির ধ্বংসের জন্যে সম্পূর্ণ অব্যবস্থার সৃষ্টি হতো।

অধ্যাপক Katsh বলেন, ইহুদী পুরোহিত Talmud গ্রন্থে পরকালের যে ধারণা দিয়েছেন তা স্বেচ্ছাচারী কোন চিন্তার ফসল নয় বরং নৈতিক প্রয়োজন। তিনি বলেন যারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এবং শেষ বিচারের দিন আমাদের সকল কাজের হিসাব দিতে হবে এবং কাজ অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার পাব তারাই দীর্ঘ কল্যাণের নিমিত্তে সাময়িক সুখ বিসর্জন ও ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন। অধ্যাপক Katsh যখন এরূপ বক্তব্য দিচ্ছিলেন আমি তখন প্রাচীন বাইবেল ও Talmud এর জ্ঞানের সঙ্গে কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে তুলনা করছিলাম এবং ইহুদী ধর্মের গলদ লক্ষ্য করছিলাম। এরপর আমি ইসলাম গ্রহণ করি।

যদিও আমি ১৯৫৪ সালে মুসলমান হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার পরিবার আমাকে যুক্তি দিয়ে এর বাইরে রাখার ব্যবস্থা করলো। আমাকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হলো যে, ইসলাম আমার জীবনে জটিলতার সৃষ্টি করবে কারণ এই ধর্ম ইহুদী ধর্ম এবং খৃষ্টান ধর্মের মত উদার নয়। আমাকে

* See ethical religion. David muzzey, American Ethical union, New york 1952, and religion without-revelation. Julian Huxley, New American library, New york, 1956

বলা হলো ইসলাম আমাকে আমার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করবে এবং সম্প্রদায় থেকে পৃথক করে দেবে। সেই সময় আমার ঈমান এসব চাপ মোকাবিলা করার মত যথেষ্ট মজবুত ছিল না। এসব আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে আমি এতই অসুস্থ হয়ে পড়লাম যে, স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার আগেই আমাকে কলেজ ছাড়তে হলো। যার ফলে আমি কোন ডিপ্লোমা অর্জন করতে পারলাম না।

পরবর্তী দু'বছর আমি বেসরকারী চিকিৎসাধীনে বাড়ীতে কাটালাম। আমার অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে লাগল। আমার পরিবার বেপরোয়াভাবে আমাকে ১৯৫৭-১৯৫৯ সাল পর্যন্ত বেসরকারী ও সরকারী হাসাপাতালে অন্তরীণ রাখলেন কারণ আমি শপথ নিয়েছি কোন রকমে সুস্থ হলেই ইসলাম গ্রহণ করব। বাড়ী ফেরার অনুমতি পাওয়ার পরই নিউইয়র্ক শহরের মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম। সৌভাগ্যবশতঃ অপ্রত্যাশিতভাবে কয়েকজন পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে পরিচিতও হলাম। এ সময় মুসলিম সাময়িক পত্রের জন্য লেখা এবং বিশ্বের মুসলমান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ শুরু করলাম।

আলজিরিয়ার আলেমদের নেতা মরহুম শেখ ইব্রাহিমী, ওয়াশিংটন ডি সি'র তখনকার ইসলামী কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ মাহমুদ এফ হোবাল্লা, আল আজহার-এর ডঃ মুহাম্মদ এল বাহাই, প্যারিসের ডঃ হামিদুল্লাহ, জেনেভা ইসলামী কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ সৈয়দ রমজান এবং মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম কবুল করার আগে আমি দেখেছি তথাকথিত আধুনিকতা আন্দোলন সমসাময়িক বিশ্বের ঈমানের পূর্ণতার ওপর বিরাট হুমকির সৃষ্টি করেছে। এর লক্ষ্য ছিল ঈমানের ধারণার সঙ্গে মানব রচিত দর্শন ও সংস্কারের গোঁজামিল দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। আমি বুঝতে পারলাম এই আধুনিকতাবাদীরা বিজয়ী হলে কোন কিছুই আর খাঁটি থাকবে না। শিশু হিসেবে আমি আমার নিজের পরিবারে দেখেছি কিভাবে উদার নৈতিকরা ওহির বিশ্বাসের অঙ্গচ্ছেদন করেছে। ইহুদী হিসেবে জন্ম এবং ইহুদী পরিবারের লালিত হয়ে আমি দেখেছি নাস্তিক্যবাদী পরিবেশের সঙ্গে ধর্মের আপোষের জন্যে কি অসার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

সংস্কার প্রাপ্ত ইহুদী ধর্ম কেবলমাত্র ইহুদীদের সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে তা নয় বরং তাকে সরাসরি উৎসাহিত করেছে। নাম ছাড়া কারও কোন ধর্মই ছিল না। আমার পুরো শিশুকালটাই আমি সংস্কার প্রাপ্ত ইহুদী ধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক অসাধুতা, মোনাফেকী এবং অন্তসারশূন্যতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এমনকি অল্প বয়সেও আমার মনে হয়েছে এমন অসম্পূর্ণ সমঝোতা ধর্মের অনুসারী এমনকি শিশুদেরও আনুগত্য আকর্ষণ করতে পারে না। মুসলমানদের মধ্যে একই দশা দেখে আমি বড়ই নিরাশ হয়েছিলাম।

আমি দেখলাম মুসলমানদের মধ্যকার কিছু পণ্ডিত এবং নেতা ঐ ধরনের পাপ করছেন। যে পাপের জন্যে আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে ইহুদীদের সীমাহীন লানত দিয়েছেন। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম যে, অপরাধের জন্যে আন্তরিক অনুতাপ এবং কার্যপ্রণালী পরিবর্তন না করলে ইহুদীদের মত আমাদেরকেও আল্লাহ্ প্রাকৃতিক বিপর্যয় দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। আমি শপথ নিলাম এসব বিপর্যয় ও বিচ্যুতি প্রতিরোধ করার জন্যে জেহাদ চালিয়ে যাব।

১৯৬১ সালের জানুয়ারীতে আমাকে লিখা প্রথম পত্রে মাওলানা মওদূদী লিখেছেন: "আমি যখন আপনার রচনা পড়ছিলাম, আমার মনে হয়েছে আমি আমার নিজের ভাবধারাই পড়ছি। আমার বিশ্বাস আপনি যখন উর্দূ শিখে আমার বই পড়ার সুযোগ পাবেন তখন আপনারও একই ধারণা হবে। আপনার সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও এই পারস্পরিক সহানুভূতি এবং চিন্তার ঐক্য নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণ করছে যে, আমরা দুজনই ইসলামের দ্বারা অনুপ্রাণিত।"

মরিয়ম জামিলা, সাবেক মার্গারেট মারকিউস।

প্রাচীন গ্রীস সমাজই ইতিহাসের গোড়ার দিকে তার নিয়ম-প্রণালী, প্রথা, শিল্পকলা ও বিজ্ঞান থেকে ধর্মকে বিতাড়িত করেছে। অপর কথায় প্রাচীন গ্রীসই ছিল প্রথম সত্যিকার, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ। তার দর্শনের ভিত্তি ছিল সৌন্দর্য ও ন্যায় বিচারে পরিপূর্ণ অখণ্ড সমাজ বুদ্ধি ও মানব মনীষার প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এতে অতি প্রাকৃতিক কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আজ পর্যন্ত এই ধর্মনিরপেক্ষ ধারণাই পশ্চিমা সভ্যতার মূল চাবিকাঠি হয়ে আছে।

প্রাচীন গ্রীকদের মতে মানুষের নগ্ন শরীরে সৌন্দর্য চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে। নর-নারীর নগ্ন দেহই গ্রীক শিল্পকলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ভাস্কর্যশিল্প এবং চিত্রকররা বিরামহীনভাবে এ চিত্র অঙ্কন করে চলেছে। শরীরের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে খেলাধূলাকে খুবই উৎসাহ দেয়া হয়। ছোট খাট বা কোন অখ্যাত শহর নেই যেখানে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের জন্যে সরকারী ব্যায়ামাগার নেই। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে উন্মুক্ত ষ্টেডিয়ামে নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। হাজার হাজার লোক এসব খেলা উপভোগ করে। অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দেরকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করা একটা প্রথায় পরিণত হয়েছে। অলিম্পিক খেলা এসব প্রতিযোগিতার মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ। এই প্রতিযোগিতা এখনও চলছে।

প্লেটোর (৪২৭-৩৪৭ খৃঃ পূঃ) রিপাবলিকের একটি উদ্ধৃতি। তিনি তার গুরু সক্রেটিসের (৪৬৯-৩৯৯ খৃঃ পূঃ) মুখ দিয়ে কল্পিত সুখ রাজ্য তথা একটি আদর্শ রাষ্ট্রের পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে- Glaucon সক্রেটিসকে প্রশ্ন করল : তুমি কি মনে কর, প্রহরারত কুকুরদের মধ্যে পুরুষ কুকুর যে কাজ করে মাদি কুকুরদেরও তা করা উচিত। অথবা পুরুষ কুকুরদের সঙ্গে কি মাদি কুকুরদেরও শিকার করা উচিত, অথবা বাচ্চা জন্ম এবং লালনের জন্যে তাদের কুকুরশালায় রাখা উচিত এবং পুরুষ কুকুরদের কি শক্ত কাজের সঙ্গে দলের রক্ষণাবেক্ষণও করা উচিত।

সক্রেটিস বললেন : তাদেরকে সবকিছু এক সঙ্গে করতে হবে। পুরুষ শক্তিশালী এবং মাদি দুর্বল কেবলমাত্র এই ধারণা ছাড়া।

কিন্তু একই প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান না দিয়ে তুমি কি পশুদেরকে একই কাজে ব্যবহার করতে পারবে?

অসম্ভব?

'এখন পুরুষদেরকে গান এবং শরীরচর্চা শিখানো হয়। সুতরাং মহিলাদেরকে এ দুটি শিল্প শিখাতে হবে এবং একইভাবে তাদের কাজে লাগাতে হবে। কুস্তির স্কুলে আমরা পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদেরকেও নগ্ন অবস্থায় ব্যায়াম করতে দেখতে চাই। শুধু যুবতী নয়-বৃদ্ধাদেরকেও। ব্যায়ামাগারে বৃদ্ধদের সঙ্গে বৃদ্ধাদেরকেও আমরা এবড়ো থেবড়ো অবস্থায় দেখতে চাই। যারা খেলায় এখনো সুন্দর তাদের দেখতে ভাল লাগে না।'

"কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পেয়েছি, এ সব জিনিস লুকিয়ে রাখার চাইতে বিবস্ত্র করা ভাল। চোখের ভালোর চাইতে যুক্তিতে যা ভাল তাই শ্রেষ্ঠ। এই সব মহিলাদেরকে পুরুষদের সাধারণ সম্পত্তি হতে হবে; কোন ব্যক্তিরই নিজস্ব ব্যক্তিগত স্ত্রী থাকা উচিত নয়, সন্তানরাও হবে সাধারণ সম্পত্তি। পিতামাতা তার সন্তান চিনবে না এবং সন্তানরাও পিতামাতা চিনবে না।"

"আমি তোমার বাড়ীতে শিকারী কুকুর এবং খেলার পাখী দেখছি। তুমি কি কোনদিন তাদের মিলন অথবা প্রজননের দিকে নজর দিয়েছো?"

"এর পর আমাদের সিদ্ধান্ত : শ্রেষ্ঠ পুরুষদের শ্রেষ্ঠ মহিলাদের সঙ্গে মেশা উচিৎ এবং কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ লোকদের লালন করা উচিত। যদি দলকে ছিম-ছাম থাকতে হয় তাহলে অন্যদের লালন করা অনুচিত। শাসকরা ছাড়া এই শিশু হত্যার কথা অন্যদের জানতে দেয়া উচিত নয়। শাসকদেরকে শাসিতের কল্যাণের জন্যে মিথ্যা এবং প্রতারণার আশ্রয় নিতে হবে। আমরা আগেই বলেছি চিকিৎসা হিসেবে এসবই প্রয়োজন। ক্রটিপূর্ণ সন্তান জন্মালে তার জন্যে খাদ্য এবং লালন পালন ব্যবস্থা নেই- এই যুক্তিতে তাকে সরিয়ে দিতে হবে।"

রোমের ইহুদী ও খৃষ্টানরা গ্রীসের এই ধর্মনিরপেক্ষ উত্তরাধিকারকে গ্রহণ, লালন এবং বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করেছে। অবশ্য সবকিছুর উর্ধ্বে রোমানরা

ছিল সামরিকমনা। ফলে সৌন্দর্য পূজার পরিবর্তে শীগগীরই শক্তি পূজা শুরু হয়েছে। গ্রীকদের আদর্শবাদ ক্রমবর্ধমান বৈরাগ্যবাদ, পলায়নবাদের রূপ নিয়েছে। এই কারণে রোমান দার্শনিক Tyre-এর maximus নাস্তিক্যবাদের পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তি দিয়েছেন।

"অবিনশ্বরের সকল কিছুর অবিনশ্বর থাকার ইচ্ছা রয়েছে। তার অপরিবর্তিত ইচ্ছায় যদি প্রার্থনা করা হয়, তিনি কি করতে বলেছেন তা তাঁকে জিজ্ঞেস করা অর্থহীন। যদি কেউ তার নির্ধারিত কাজের বিপরীত করার জন্যে তার কাছে প্রার্থনা করে, প্রার্থনাকারী চায় সে দুর্বল, নগণ্য, অসঙ্গত হোক। তিনি দুর্বল, নগণ্য এবং অসঙ্গত বিশ্বাস করার অর্থ তাকে নিয়ে তামাসা করা। তোমার কোন ভাল কাজের ইচ্ছা জাগলে তোমার প্রার্থনা ছাড়াই তিনি তা করবেন। তার কাছে অনুনয় করার অর্থ তাকে অবিশ্বাস করা, অথবা বিষয়টি এমন অন্যায় যার দ্বারা তুমি তাকে অপমান করো। তুমি উপযুক্ত হও অথবা অনুপযুক্ত হও– করুণা তুমি পাবে, যদি তুমি উপযুক্ত হও– সে তোমার চাইতে ভাল জানে, যদি অনুপযুক্ত হও, যা পাওয়ার যোগ্য নও তা চেয়ে তুমি আরেকটি পাপ করো। এক কথায় আমরা স্রষ্টার কাছে এজন্য প্রার্থনা করি যে তাকে আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধতায় চিন্তা করি।" *(The portable Voltaire Viking press New york, 1949)*

রোম সাম্রাজ্যের পতন এবং রেনেসাঁর উদ্ভব পর্যন্ত হাজার বছরে রোমান ক্যাথলিক গীর্জাই প্রাধান্য পেয়েছে। মধ্যযুগ নামে পরিচিত এই সময়ে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সঙ্গে ইউরোপের ঐতিহাসিক পারম্পর্য বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বস্তুতঃ মধ্যযুগ তার নিজস্ব সুস্পষ্ট ও একক সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। প্রাচীন গ্রীস, রোমান সমাজ বা আজকের ইউরোপের সঙ্গে সাম স্যপূর্ণ কোন বৈশিষ্টই তার নেই। বস্তুতঃ মধ্যযুগের সভ্যতাকে কেবলমাত্র ভৌগলিক অবস্থানের কারণে পশ্চিমা বলা যেতে পারে।

মধ্যযুগীয় সভ্যতা সকল দিক থেকে আধুনিক সভ্যতার বিরোধী এবং বিপরীতধর্মী ছিল। এ কারণে ইউরোপের ইতিহাসের কোন অধ্যায় সম্পর্কে অপবাদ দেয়া হয়নি। একই কারণে ইংরেজী ভাষায় 'মধ্যযুগীয়' শব্দের চাইতে খারাপ ভাষা ব্যবহৃত হয়নি। যখনি কোন আমেরিকান বা

ইউরোপীয় এই বিশেষণের সম্মুখীন হয়েছেন তার মনে বর্বর, সামন্ত অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের 'কালোযুগ' ভেসে উঠেছে। কোন পশ্চিমা লোক বিশ্বের কোন এলাকা বিশেষ করে অনগ্রসর এলাকার বর্ণনা দিতে ইচ্ছুক হলে তাকে 'মধ্যযুগীয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইউরোপের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সমালোচনা মুক্ত ভক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে খৃষ্টান ধর্ম পরিহারকে রেনেসাঁসের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। রেনেসাঁ সত্যিকারভাবে বুঝিয়েছে খৃষ্টান ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নবায়ন। এই ভাবে পশ্চিমা সভ্যতা তার আদি বক্তব্যে ফিরে গেছে। এখন পর্যন্তও সেভাবেই চলছে।

রেনেসাঁর মূল প্রেরণার সংক্ষিপ্তসার যারা দিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন Ivicolo machiavelli (১৪৬৯-১৫৩২)। ইতালীর ফ্লোরেন্সের অধিবাসী মেকিয়াভেলি তার সরকারের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করেন। তার তের বছরের কর্মজীবনে পার্শ্ববর্তী স্পেন এবং ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির তুলনায় ইতালীর অসহায়ত্ব তাকে হীনমন্য করে রেখেছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের পর মেকিয়াভেলি পদচ্যুত এবং দেশান্তরিত হন। প্রবাসী জীবনে তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন, সংহতকরণ ও সম্প্রসারণের ব্যাপারে সব চাইতে প্রভাবশালী বক্তব্য সম্বলিত The prince পুস্তক রচনা করেন। সব কিছুর উর্ধে মেকিয়াভেলী ছিলেন জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক। তার স্বপ্ন ছিল আধিপত্যশালী বিশ্বশক্তি হিসেবে অখণ্ড ইতালীর আত্মপ্রকাশ। মেকিয়াভেলী ছিলেন আধুনিক একদলীয় শাসনের জনক। তিনি ক্ষমতাকে তার চূড়ান্ত শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

"আমি জানি কোন প্রিন্সের মধ্যে সকল সদগুণ সকলের প্রশংসার্হ।" তবে সেগুলো কারো পক্ষে অর্জন, ধারণ বা পালন সম্ভব নয়, একজন মানুষের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। সে যদি মনে করে থাকে তাকে সকল অন্যায় পরিহার করার মত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হতে হবে, দেখা যাবে গুণ বলে বিবেচিত এমন কিছু জিনিসও কারো ধ্বংসের কারণ হতে পারে এবং এমন কিছু জিনিস– যা দোষ বলে মনে হয়– তা কারো বৃহত্তর নিরাপত্তা এবং কল্যাণে আসতে পারে।

প্রত্যেকেই জানেন ধূর্ততা ছাড়া কোন প্রিন্স যদি সকলের বিশ্বাস নিয়ে নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করে তা কতই প্রশংসনীয়। তবুও আমাদের যুগের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, যে সব প্রিন্স মহৎ কাজ করেছেন সৎ বিশ্বাসের প্রতি তাদের সামান্য শ্রদ্ধাই আছে, তারা ধূর্ততার সঙ্গে মানুষের মস্তিস্ক বিগড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সৎ লোকদের ওপর জয়ী হয়েছেন।

এই ধরনের একজন প্রিন্সকে পশুর মত কাজ করার জন্যে শৃগাল এবং সিংহের অনুকরণ করতে হবে। কারণ সিংহ নিজেকে ফাঁদ থেকে রক্ষা করতে পারে না এবং শৃগাল নিজেকে নেকড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। অতএব একজন প্রিন্সকে ফাঁদ চেনার জন্যে শৃগাল এবং নেকড়েদের ভীত করার জন্যে সিংহ হতে হবে। যারা কেবল সিংহ হতে চান তারা এটা বোঝেন না। সুতরাং বুদ্ধিমান শাসককে কখনো শাসিতকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, এটা তার স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। যখন তিনি যুক্তি দিয়ে তা বুঝবেন তখন ক্ষমতা তার নাগালের বাইরে চলে যাবে। যদি সকল মানুষ ভাল হতো তাহলে এই উপদেশ সঠিক হতো না। কিন্তু যেহেতু তারা খারাপ এবং তোমার সঙ্গে বিশ্বাস রক্ষায় বাধ্য নয়, সুতরাং তুমিও তাদের সঙ্গে বিশ্বাস রক্ষায় বাধ্য নও। অনেকে প্রিন্সের বিশ্বাস ভঙ্গের ফলে কত প্রতিশ্রুতি মূল্যহীন হয়েছে এবং কত অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে তার ভুরি ভুরি আধুনিক নজির তুলে ধরবেন এবং যারা শৃগালকে অনুকরণ করেছে তারাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে বলে প্রমাণ দেবেন। তবে এই চরিত্র গোপন রাখা প্রয়োজন এবং ভান করা, কপটতা দেখানো খুবই ভাল। মানুষ এতই সরল এবং বর্তমান প্রয়োজনকে মেনে নিতে এতই প্রস্তুত যে যিনি প্রতারণা করেন তিনি দেখবেন যে, প্রতারিতরাই প্রতারণার সুযোগ দিয়েছে।

একজন প্রিন্সকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে, তার মুখ থেকে যেন ক্ষমা, বিশ্বাস, মানবতা, আন্তরিকতা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধী কোন কথা না বেরোয়। এই গুণ ছাড়া আর বিশেষ কিছুর প্রয়োজন নেই কারণ মানুষ সাধারণতঃ হাতের চাইতে চোখ দিয়েই বিচার করে। কেননা প্রত্যেকেই দেখতে পায় কিন্তু অল্প লোকই অনুধাবন করতে পারে। প্রত্যেকেই দেখে তুমি দেখতে কেমন, খুব অল্প লোকই অনুধাবন করে তুমি কি এবং এই স্বল্পসংখ্যকরা বহু লোকের যুক্তির কাছে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশে সাহসী

হবে না। মানুষের কাজ বিশেষ করে প্রিন্সের কাজের বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ থাকে না। "উদ্দেশ্যই উপায়ের যথার্থ নির্ধারণ করে।"

প্রটেষ্টান্টদের সংস্কার আন্দোলন খৃষ্টান ধর্মের ওপর এমন আঘাত হেনেছে যে, পরবর্তীকালে কখনো খৃষ্টানধর্ম তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। গীর্জার ক্ষমতা, দুর্নীতি ও অপকর্মের সংশোধনের কোন পথ না পেয়ে মার্টিন লুথার তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন এবং নিজে একটি ধর্মমত প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। পোপের কর্তৃত্ব ও ল্যাটিন ভাষা প্রটেষ্টান্টদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ খুবই শক্তিশালী হয়েছে। শক্তিশালী খৃষ্টান সাম্রাজ্যের স্থলে বহু ক্ষুদ্র, দুর্বল গোত্রের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকেই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অপরের বিরোধীতা করেছে। প্রটেষ্টান্ট দেশসমূহে সরকারী নিয়ন্ত্রণে জাতীয় গীর্জা স্থাপন করা হয়েছে। ইউরোপের অন্যান্য জায়গার মত ধর্মের আধ্যাত্মিক শক্তি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শাসকদের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

সংক্ষেপে প্রটেষ্টান্ট সংস্কার আন্দোলনের পর রেনেসাঁর পন্ডিতরা গীর্জার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকেই সব চাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার বানিয়েছে। ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬১৫) The new atlantis গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক প্রেরণার সার সংক্ষিপ্ত করেছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কাল্পনিক দ্বীপে একটি ইংলিশ জাহাজ অবতরণ করবে তার প্রধান গর্বের কাজ হবে বিজ্ঞান গবেষণার জন্যে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। শাসক যাত্রীদেরকে এই বলে পরিচালিত করেছেন "জ্ঞানানুসন্ধান ও জিনিসের গুপ্তরহস্য উদ্ধার করে সম্ভব সকল জিনিসের পরিচয় উদ্ঘাটনের মাধ্যমে মানব সাম্রাজ্যের সীমা বাড়ানোর পর আমাদের ভিত্তি স্থাপন সমাপ্ত হবে।"

Descartes পরীক্ষামূলক পদ্ধতির উন্নয়নের ওপর গবেষণা চালান অপরদিকে জ্ঞাত জিনিসের প্রমাণের পরিবর্তে নতুন সত্য আবিষ্কারের জন্যে Francis bacon, এরিষ্টটল ও মধ্যযুগীয় পন্ডিত দার্শনিকদের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গবেষণা শুরু করেন। Descartes এর মত পশ্চিমা দার্শনিকদের কাছে প্রকৃতি আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যবিহীন যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষসহ সকল জীবন্ত প্রাণী স্বয়ংক্রিয় রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি। Descartes দম্ভপূর্ণ উক্তি করে বলেছেন "আমাকে উপাদান দাও আমি বিশ্ব সৃষ্টি করব"।

অপরিবর্তনীয় গাণিতিক আইনে সমগ্র সৌরজগত পরিচালিত হয়, নিউটনের (১৬৪৩-১৭২৭) এই মতবাদে আত্মহারা হয়ে তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত যুগের প্রবক্তারা প্রচার করেছেন, মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের বিপরীত সকল বিশ্বাস পরিহার করতে হবে। ভাগ্য, ভবিষ্যৎ বাণী ওহিসহ সকল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে কুসংস্কার বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছে। Valtaire (১৬৯৪-১৭৭৮) বলেছেন : পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন চিন্তা না করেই ঘড়ি সংযোজন কারীর মত ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। Hume (১৭১১-১৭৭৬) সকল ধর্মীয় বিশ্বাস এই বলে বাতিল করেছেন যে, এগুলো বিজ্ঞান বা মানবীয় প্রজ্ঞার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। তিনি ভল্‌তেয়ারের প্রত্যাদেশ (ওহি) ক্ষমতাহীন ঈশ্বরকে আক্রমণ করে বলেছেন : আমরা ঘড়ি বানাতে দেখেছি কিন্তু পৃথিবী বানাতে দেখিনি!

যদি পৃথিবীর কোন মালিক থাকেন, তিনি অনুপযুক্ত কর্মী অথবা কাজ সমাপ্ত করে অনেক আগে মারা গেছেন বা তিনি পুরুষ অথবা মহিলা ঈশ্বর বা অনেক সংখ্যক ঈশ্বর আছে। তিনি সম্পূর্ণই ভাল, সম্পূর্ণই খারাপ অথবা দুই বা কোনটাই নন। সম্ভবতঃ তিনি খারাপ। পরকালের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে হিউমের যুক্তি হচ্ছে : কোন জীবন সম্পর্কে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন যুক্তি নেই যে, যেখানে মানুষের ফেলে যাওয়া জীবনের জন্যে পুরস্কার কিংবা শাস্তি দেয়া হবে। গণিত যেমন ধর্মতত্ব ও মানব জ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে স্বাধীন ঠিক তেমনি নৈতিকতাও একটি বিজ্ঞান। Dideroit এবং রুশোর মত দার্শনিকেরা সম্মত হয়েছেন যে, ব্যবহার এবং সুখই নৈতিকতার একমাত্র মান নির্ণায়ক। সঙ্গীদের ন্যায্য অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত না করে মানুষের উচিত যতবেশী সম্ভব আনন্দ ও সুখ প্রত্যাশা করা। কোন সম্পর্কই সকলকে আনন্দ দিতে পারে না, তবে উপকার করতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে তারা লক্ষ্য করেন যে, পুরুষ নারীর চিরাচরিত সততার দাবীর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

অতীতের সকল বিশ্বাসকে ভ্রান্ত জ্ঞান ও ধ্বংস করে 'আলোকপ্রাপ্ত'রা বিশ্বাস করলেন যে, সার্বজনীন গণশিক্ষা যে বুদ্ধি বৃত্তি ও বিজ্ঞান প্রচার করেছে তাতে বিশ্বে একটি সত্যিকার স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবে। নিজের ভাগ্য রূপ দেয়ার বৈজ্ঞানিক যাদু এখন মানুষের করায়ত্বে রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে স্বাধীনতা,

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য এবং সার্বজনীন শান্তি বিরাজ করবে। ক্রমবর্ধমান জ্ঞান মানব জীবনকে দীর্ঘায়িত করবে এবং সকল রোগ ও কষ্ট নিঃশেষ করে দেবে। পরবর্তী শতকের প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এই নতুন বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করেছে যে, কোন অলৌকিক সাহায্য ছাড়াই বিশ্বের মানব জীবন পরিপূর্ণতা অর্জন করে।

নিম্নস্তরের প্রাণী থেকে বিবর্তনবাদের মাধ্যমে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কিত ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) মতবাদ নৈতিক মূল্যবোধকে নূতন খাতে প্রবাহিত করেছে। দার্শনিকরা এখন চিন্তা শুরু করলেন যে, অবিরাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবসমাজ অনিবার্যভাবে আরো উচ্চ এবং জটিল অবস্থায় গিয়ে পৌঁছুবে। মানব সমাজে জৈবিক বিবর্তনবাদ প্রয়োগ হওয়ার ফলে এই সমাজ 'আধুনিক' 'অত্যাধুনিক' অগ্রসরমান এবং প্রগতিশীল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ঐতিহাসিকরা মানুষকে প্রকৃতির সন্তান এবং অংশ হিসেবে দেখতে থাকলো। খুবই নিম্ন পর্যায়ে থেকে বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে মর্মন্তুদ সংগ্রাম করে মানুষ বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে বলে ধরে নিলাম। ডারউইন পশ্চিমা দার্শনিকদের বুঝালেন যে, মানুষ অন্যান্য পশুর মতই একটি সাধারণ স্তন্যপায়ী প্রজাতি। William James (১৮৪২-১৯১০) বিবেক অথবা মনের অস্পষ্ট ধারণার মূল্য সম্পর্কেও প্রশ্ন তুললেন। তার মতে এটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফল এবং স্নায়ুর ওপর বাইরের চাপের ফলে সব কিছুর সৃষ্টি। মনস্তত্ত্ববিদ Pavlov (১৮৪৯-১৯৩৬) কুকুর, বানর ও গেরিলার ওপর গবেষণা চালিয়ে মানুষের ব্যবহারের কার্যকারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

FREUD (১৮৫৯-১৯৩৯) মানুষের অসংগত ব্যবহারের মূলে আবিষ্কার করলেন শৈশব অবস্থায় অপরিণত মস্তিষ্কের ওপর চাপ। আধুনিক দার্শনিকেরা ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে আরেকটি হাতিয়ার পেলেন। ফ্রয়েড বললেন ছোট শিশু তার মা বাবার অনুসরণ করল। কারণ তাঁরা তার জীবন দিয়েছেন, কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন, সুশৃংখল থাকতে বাধ্য করেছেন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর ধর্মীয় আচার আচরণের জন্যে পুরস্কার ও শাস্তির ভয় দেখালেন। ধর্ম মানুষের তৈরী এবং নৈতিকতা অবিসংবাদিত নয়, বরং আপেক্ষিক এই ধারণা ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ও নৃতত্ত্বের ছাত্রদের কাছে খুবই ভাল লাগল।

এই ভাবে বিশিষ্ট মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ তার The tree of culture (১৯৫৩) নামক পুস্তকে বললেন : ইহুদীধর্ম ও ইসলামের আপোষহীন একত্ববাদ আরবের যাযাবর উপজাতির পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ধারণা থেকে উদ্ভুত। তিনি লিখলেন : "সর্বশক্তিমান দেবতার ধারণা প্রাচীন আরব জাতির পারিবারিক জীবন থেকে সরাসরি এসেছে। এই দেবতা ন্যায়-অন্যায় করুক পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করা যায়। প্রতিটি কাজের ব্যাপারে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল সৃষ্টিকারী অতি স্বাতন্ত্র্যবাদও মুসার (আ) আইন কানুনের সারসংক্ষেপ। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার এই বেড়াজালে বিশ্বাসী লোকেরা এমন শিশুর মত হয়েছে যে, শিশু তার বাবার আদেশ নিষেধই মনে রাখতে সক্ষম। ঈশ্বর আরবীয় পরিবারের পিতার প্রতিমূর্তি– যার পিতৃতান্ত্রিক একনায়কত্বের গুণের অতিশয়োক্তি রয়েছে।

ফ্রয়েড ধর্মের ঐশ্বরিক উৎপত্তির কথা অস্বীকার করেই সন্তুষ্ট হননি। বরং ধর্মীয় বিশ্বাস যে কোন দিক থেকে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে এই ধারণাও বাতিল করেছেন।

"এটা সত্য নয় যে বিশ্বের এমন একটি শক্তি আছে যে, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কল্যাণ দেখাশুনা করে এবং তাদেরকে আবার নিজের কাছে ফিরিয়ে নেয়। আদতে মানুষের ভাগ্য সার্বজনীন ন্যায় বিচারের নীতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। ভূকম্পন, বন্যা এবং আগুন সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ এবং পাপী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য করে না। এমনকি সমস্ত খারাপ লোক ও ভাল লোকগুলো পৃথক থাকলেও আমরা কোন অবস্থায় দুষ্টদের শাস্তি পেতে এবং গুণীদের পুরস্কৃত হতে দেখি না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় খারাপ ও অসৎ লোকেরা যা চায় তাই পায়। কিন্তু ধার্মিকেরা শূন্য হাতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। মায়ামমতাহীন দাম্ভিক শক্তিই মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে। ধর্ম যে ঐশ্বরিক ন্যায় বিচারের শাসনের কথা বলে তার কোন অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের প্রাধান্য যতই অস্বীকার করা হোক তাতে প্রকৃতি ও বহিঃর্বিশ্বের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা পরিবর্তিত হবে না। অপরদিকে ধর্ম একটি বালকসুলভ মায়া বিভ্রম। আমাদের সহজাত আকাঙ্খাতেই তার শক্তি নিহিত।" (Freud : Great Thinkers of the Western World, Encyclopedia Britanica)

কার্ল মার্কসের হাতে বস্তুবাদী দর্শন চূড়ান্ত রূপ পেলো। কার্ল মার্কসের মতে মানব ইতিহাসে সমাজ এবং সংস্কৃতির সবদিকই অর্থনৈতিক কার্যকারণের ফলশ্রুতি। ব্যক্তি বিশেষ তার চারিদিকের ঘটনাবলীর সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুগত পরিবেশের গতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। আজকের পশ্চিমা সভ্যতার পিছনে মার্কসের মতবাদের বিরাট অবদান রয়েছে। মার্কসীয় মতবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সোভিয়েত ইউনিয়নেও আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হয়। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন লক্ষ্য সম্পর্কে সৎ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফন্দিবাজ এবং কপটাচারী।

বার্টাণ্ড রাসেল বস্তুবাদী দর্শন তুঙ্গে পৌঁছিয়ে দেন। তিনি লিখেন : "মানুষ কার্যকারণের সৃষ্টি, তার প্রাপ্তির শেষ নেই, তার জন্ম, বৃদ্ধি, আশা, ভয়, ভালবাসা, বিশ্বাস অণুর বিন্যাসের ফলশ্রুতি। কোন প্রকার বীরত্ব চিন্তার গভীরতা এবং আবেগ ব্যক্তি বিশেষকে কবর থেকে দূরে রাখতে পারে না। অর্থাৎ যুগের সকল পরিশ্রম, সকল নিষ্ঠা মানব মনীষার সকল প্রেরণা সৌর জগতের বিশালকায় মৃত্যুর মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য। মানুষের সাফল্যের সমগ্র মন্দির বিশ্বের ধ্বংসাবশেষের নীচে অবশ্যই সমাধিস্ত হবে। এসব জিনিস এতই নিশ্চিত যে, তাদেরকে অস্বীকারকারীর কোন দর্শনই টিকে থাকতে পারে না। এ সত্যের মঞ্চে কেবলমাত্র অনমনীয় হতাশার দৃঢ় ভিত্তির দ্বারাই নিরাপদ মানব বসতি গড়ে তোলা সম্ভব।" (Makers of Modern Mind, Randall, Columbia University Press, New work 1930)

Schopen Hauer বস্তুবাদী দর্শনের যৌক্তিক সমাধান টানলেন। তার কাছে জীবনের অস্তিত্ব লক্ষ্যহীন, চঞ্চল তৎপরতা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক শক্তি। "সকল আকাঙ্খার মূলে রয়েছে প্রয়োজন, ঘাটতি এবং তা–ই কষ্টকর। মানুষের প্রকৃতি মূলতঃ নিষ্ঠুর এবং তার অস্তিত্ব তাই কষ্টকর হতে বাধ্য। অপরদিকে সে যদি সহজ সন্তুষ্টির সঙ্গে সকল কাঙ্খিত জিনিস লাভ করে এ ধরনের অসার ক্লান্তিতে তার হৃদয় ভরে গেলে সে হৃদয় তার জন্যে অসহনীয় বোঝা হয়ে পড়ে। এই ভাবে জীবন গোলকের মত কষ্ট থেকে ক্লান্তিতে এবং ক্লান্তি থেকে কষ্টে দোল খেতে থাকে। জীবন শিলা ও

আবর্তে পরিপূর্ণ সমুদ্রের মত, মানুষ যা সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করে যদিও সে জানে যে সকল প্রচেষ্টা এবং দক্ষতার সঙ্গে প্রবেশ করতে পারলেও সে জাহাজডুবি তথা মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছায়। প্রতিটি মানুষ এবং তার জীবনে গতি-প্রকতির সীমাহীন প্রেরণায় আরেকটি ক্ষনিকের স্বপ্ন মাত্র। বেঁচে থাকার অবিরাম প্রচেষ্টায় মানুষ প্রকৃতির সীমাহীন প্রান্তরে এসে ঠাঁই নেয়। প্রকৃতিও ক্ষণিকের জন্য আশ্রয় দিয়ে আবার সীমাহীন অতলান্তে বিলীন করে দেয়।" (Makers of the Modern Mind)

ধর্ম বিশ্বাসের বাস্তব মূল্য অস্বীকার করে ফ্রয়েডকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, বিজ্ঞান বিকল্প নয়। "বাস্তব জগতের ওপর গুরুত্ব ছাড়া বিজ্ঞান অবশ্যই নেতিবাচক বক্তব্য দেয়। তার সীমা স্পর্শনীয় বস্তুগত সত্য এবং মায়াকে সে অস্বীকার করে। আমাদের অনুসারীদের যারা এ ধরনের কার্যাবলীতে অসন্তুষ্ট এবং ক্ষণেক শান্তির জন্য আরো অধিক আকাঙ্খা করেন তারা যেখানে তা পাবেন সেখানে খোঁজ করতে পারেন। কিন্তু আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি না।' (Encyclopedia Britanica)

"বর্তমান জীবনের কষ্ট, ক্ষুধা, যন্ত্রণা, বার্ধক্য, মৃত্যু এবং ক্ষত স্পষ্ট হয়েছে অথবা সম্ভবতঃ আগের চাইতে একটু বেশী করে অনুভূত হয়েছে দু'টি বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা। কবি ও উপন্যাসিকসহ বস্তুবাদী চিন্তাবিদদের খোদার বিরুদ্ধে বাদানুবাদের মূল বিষয়ও এটি। তারা তাঁর করুণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং ধর্মতত্ত্ববিদদের পরামর্শ দিয়েছেন প্রতি ফোটা অশ্রুর জন্যে পুরস্কারের অঙ্গীকার করে মানব মনীষার সঙ্গে তামাসা না করতে। কারণ কাগজের নোটের নগদ বিনিময় মূল্যের নিশ্চয়তা না থাকলে তা স্রেফ ধোকা।

এই উচ্চ বাচ্যের মূল হচ্ছে জীবনের অমরত্বে অবিশ্বাস। আমরা যদি এখন ব্যর্থ হই, আমরা চিরদিন ব্যর্থ হবো কারণ কোন অতীতই ফিরে আসে না। যদি আমরা এ জীবন হারাই আমরা সব কিছুই হারালাম কারণ এটাই প্রথম এবং শেষ সুযোগ। মৃত্যু আসার সঙ্গে সঙ্গেই আশা-আকাঙ্খা, বিপদ, ভয়, পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা হঠাৎ থেমে যায়। জীবনের এই সীমিত ধারণা নিয়ে এটাই স্বাভাবিক যে, আমাদের দুঃখ কষ্টের হিসাব করব এবং অন্যায়

অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার কামনা করব এবং ভাববো আমরা যে সব অন্যায় আচরণের শিকার সবই আমাদের নিজেদের তৈরী।"

অন্যায় আচরণ সম্ভবতঃ কোনদিন সম্পূর্ণ শেষ হবে না। এসব থাকতে এসেছে। খোদা সবাইকে মোহাম্মদ আলীর (মুষ্ঠিযোদ্ধা) মত স্বাস্থ্য, রকেফেলারের মত ধন এবং বার্টাণ্ড রাসেলের মত বুদ্ধিমত্তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেননি। তিনি অভাব, দারিদ্র রোগ এবং বার্ধক্যের জন্যে সার্বজনীন বীমা পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেননি। বিজ্ঞানীরা আমাদের ওয়াদা দিতে পারেন যে, এই শতক শেষ হওয়ার আগে প্রত্যেক ব্যক্তির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ী এবং গাড়ী থাকবে। তপ্ত সূর্যের নীচে কিভাবে ঘামাতে হয় অথবা শীতের রাতে কি ভাবে কাঁপতে হয় আমরা জানবো না। আমাদের ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিও আরামদায়ক কাজ পাবে, মনোমুগ্ধকর ও প্রচুর বেতন পাবে এবং একই সঙ্গে যুগের শিল্পকলা ও সংস্কৃতি উপভোগ করার মত অখণ্ড অবসর পাবে। এধরনের স্বপ্ন যদি সত্যি হয় তাহলে মানবতার জন্যে সেটি দুর্ভাগ্যের দিন হবে।

আমরা পৃথিবীতে এসেছি কাজ করতে, সংগ্রাম করতে, আমাদের দুঃখ ও উৎকণ্ঠার শরীক হতে এবং পৃথিবীর কল্যাণে অবদান রাখতে, আধ্যাত্মিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, অত্যাচার এবং অবিচার, হিংসা, ঘৃণা লাঘব বা নির্মূল করতে। এটি একটি বিরাট কাজ সম্ভবতঃ আমরা তা শেষ করতে পারবো না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের চেষ্টার দ্বারা আমরা ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর দৃষ্টিতে কতটা লাভবান হলাম সেটাই আমাদের দেখার বিষয়। বাকীটুকু দেখা আল্লাহর নিজের দায়িত্ব। কেবলমাত্র এই ধরনের আশা ও প্রচেষ্টার দ্বারা পৃথিবীতে আমাদের জীবন, কাজ এবং মুত্যু কামনা করা উচিত*।

---

* S. Ahmad, Back to God v. Yaqeen International, karachi April 22, 1967.

আধুনিক দর্শন : এর বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি

আধুনিকতা, ধর্ম এবং তার সকল আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহ। ইউরোপীয় রেনেসাঁ বিশেষ করে মেকিয়াভেলির নীতিজ্ঞানশূন্য রাজনৈতিক দর্শনে এই বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয়। ১৮ শতকের আলোকপ্রাপ্ত ফরাসী দার্শনিকের হাতে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং ১৯ শতকের ইউরোপ ডারউইন, মার্কস এবং ফ্রয়েডের হাতে তা সর্বোচ্চ সীমা প্রাপ্ত হয়। পশ্চিম ইউরোপের জন্মস্থান থেকে এই দুষ্ট ক্ষত বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে হামলা চালিয়ে দেশীয় সংস্কৃতি ধ্বংস করেছে। বস্তুতঃ এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আধুনিকতা সর্বব্যাপী এবং সার্বজনীন বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। যারাই এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আলোকপ্রাপ্ত এবং প্রগতিশীল বলে অভিনন্দিত করা হয়েছে অপর দিকে যারা অনীহা দেখিয়েছে তাদেরকে অনগ্রসর, মধ্যযুগীয় এবং প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে কোণঠাসা করা হয়েছে। এই কারণেই এশিয়া ও আফ্রিকার নেতারা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আধুনিকতার প্রতি এতই অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করেছে যে প্রকারান্তরে তারা তাদের উপনিবেশিক শাসকদেরও হার মানিয়েছে।

আধুনিকতা কম্যুনিজম, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, প্রয়োগবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, ইহুদীবাদ, কামালবাদ এবং আরব জাতীয়তাবাদের ছদ্মাবরণে আবির্ভূত হয়েছে। অবশ্য এইসব আধুনিক মতাদর্শের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং ঘৃণা সত্ত্বেও নিবিষ্ট পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে তারা একই গাছের বিভিন্ন শাখা মাত্র।

আধুকিতার মূল বক্তব্য পরকালকে অস্বীকার করা। পরকালকে অস্বীকার করার ফলে অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্ত আসে যে, দৈহিক আরাম আয়েশ, বস্তুগত সমৃদ্ধি, পার্থিব সাফল্য এবং ব্যক্তিগত সুখই জীবনের লাভজনক লক্ষ্য। মানুষের কাজের জন্যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহীর কথা অস্বীকার এবং ন্যায়ই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে এই বিশ্বাস ধ্বংস করে নৈতিকতার ওপর মরণাঘাত হেনেছে।

সকল আধুনিক মতাদর্শের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মানব পূজা। কোন কোন সময় বিজ্ঞানের ছদ্মাবরণে মানব পূজা চলে। আধুনিকতাবাদীরা জানেন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতি পর্যায়ক্রমে তাদেরকে ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী করবে। মানব পূজার আরেকটি ধরন হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিদেশী ও সংখ্যালঘুদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে নিজের বিশেষ দলের পূজা। নাৎসী জার্মানীতে ইহুদী হত্যা,ইসরাঈলে আরব হত্যা, ভারতে মুসলমান হত্যা এবং অতি সম্প্রতি সাইপ্রাসে তুর্কী হত্যার ঘটনায় এর প্রমাণ মিলে। জাতীয়তাবাদ সর্ব শক্তির অধিকারী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য দাবী করে। রাজনৈতিক নেতারা দেবতায় পরিণত হয়। তাদের ছবি এবং মূর্তি সর্বত্র জনসমক্ষে রাখা হয়। নাৎসী সৈন্যরা বক্ষে হিটলারের ছবি রাখতো এবং যদি তারা আহত অথবা হাসপাতালে মারা যেতো তাদেরকে এ ছবি চুম্বন এবং চোখের ওপর রাখতে দেখা যেতো।

রাশিয়ায় প্রায় সাড়ে চার দশক ধরে একটি কাঁচের পাত্রে লেনিনের মরদেহ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয়। মস্কোর রেডস্কোয়ারস্থ তার সমাধি জাতীয় মাজার, শীতকালে এক নজর দেখার জন্যে মানুষ সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। লেনিনের সমাধি পরিদর্শনকারীরা সেখানে গীর্জার মত পরিবেশ দেখতে পান। ষ্টালিনের মৃত্যুর পর তার মরদেহও একই কায়দায় কাঁচের পাত্রে যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ক্রুশ্চেভ তাকে অস্বীকার করার পর একই সঙ্গে সকল গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে তার ছবি ও মূর্তি অপসারণ করা হয়েছে। চীনের কম্যুনিষ্ট শাসনের অধিনেও মাও সেতুংকে ঈশ্বরের মত পূজা করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে তার লিখা বইকে ধর্মীয় গ্রন্থের মর্যাদা দিতে শেখানো হচ্ছে।

রেলের কামরা, সরকারী বাস, রেস্তোঁরা, রাস্তার মোড়, রাস্তার পার্শ্বের পায়ে চলার পথ, বিমান বন্দরে যাত্রীদের বসার স্থান অথবা আকাশে উড্ডয়নরত বিমান যাই-ই হোক না কেন সব জায়গায় রেডগার্ডরা রয়েছে এবং মাও-এর বাণী নিয়ে গান, আবৃত্তি ও নাচানাচি করছে। চীনের বাণিজ্যিক বিমান পরিবহনে চকলেট, চা এবং সিগারেট দেয়ার পর পরই যুবতী বিমানবালারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে লাল বই বের করে মাও-এর বাছাইকৃত অংশগুলো পড়তে থাকে। যাত্রীরা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ

করুক আর নাই-ই করুক এরপর তারা কোরাস গাইতে থাকে। এই 'পবিত্র অনুষ্ঠান শেষ হলে বিমান বালারা নেচে নেচে গান শুরু করে। বিমান বন্দরে অবতরণ পর্যন্ত এ নাচ গান চলতে থাকে। সমগ্র চীনের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠান চলে।*

কোন ব্যতিক্রম ছাড়া সকল আধুনিক মতাদর্শ অতীন্দ্রিয় মূল্যবোধকে অস্বীকার করে। অপর কথায় সত্য নির্ণয়ের কোন চূড়ান্ত মাপকাঠি নেই। বরং সততা, নৈতিক মূল্যবোধ আপেক্ষিক বিষয়। সময় স্থান ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের যথার্থতা সীমিত। 'ওহি' ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে আধুনিকতাবাদীরা গতিহীন এবং অসার বলে অভিহিত করেছেন। পরিবর্তনই একটা গুণ এবং যত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হয় ততই ভাল। আধুনিকতাবাদের চূড়ান্ত গুণ হচ্ছে 'আধুনিক' মহিলাদের পোশাকের ক্ষেত্রে সর্বশেষ ফেশান, সর্বাধুনিক মডেলের গাড়ী এবং নাচের সর্বাধুনিক মুদ্রাকে সবকিছুর উর্ধে স্থান দেয়া হয়।

আধুনিক মতাদর্শের অপর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন ও জীবনকে যতদূর সম্ভব শিথিল করা। কার্ল মার্কস নিজেও তার কমিউনিষ্ট ঘোষণা পত্রে (১৮৪৮) পারিবারিক জীবন পুরোপুরি শেষ করে দেয়ার ওকালতি করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কম্যুনিষ্ট চীন এই লক্ষ্য সাফল্য জনকভাবে অর্জন করেছে। অকম্যুনিষ্ট দেশে সুক্ষ্মভাবে এই প্রচেষ্টা চলছে, তবে কার্যকর হচ্ছে না। পরিবারের বিরুদ্ধে প্রধান হাতিয়ার ১। শিল্পায়ন ২। শহর কেন্দ্রিক জীবন ৩। নারী মুক্তি।

বস্তুতঃ তিনটি ব্যাপার একই সঙ্গে চলতে থাকে। আধুনিক শিল্পায়ন ব্যবস্থা উচ্চ বেতন ও অন্যান্য বস্তুগত সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে বিরাট সংখ্যক সুস্থ সবল লোককে পরিবার ও গ্রামের সুসংহত সমাজ বন্ধন থেকে টেনে বিরাট শহরের অজ্ঞাত পরিবেশে নিক্ষেপ করে। এই ভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবার ভেঙ্গে যায় এবং পৃথক হয়ে যায়। শিল্পোন্নয়নের ফলে পরিবার আত্মনির্ভর অর্থনৈতিক ইউনিট থাকতে পারে না। এর ফলে পিতা তার জীবনের অধিকাংশ সময় বাড়ী এবং স্ত্রী থেকে দুরে থাকেন। ফলে

* সাংস্কৃতিক বিপ্লব। "Chinas new Generation Taking over" Qudratullah Shahab, The Pakistan Times, Lahore, October-1, 1967.

স্ত্রীও সংসারের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে অন্যদিকে আসক্ত হয়ে পড়েন। যদিও শিশুসদন, কিন্ডার গার্টেন এবং স্কুলগুলোর সংখ্যা ক্রমাগত বর্ধিত হারে ছেলের অভিভাকত্ব গ্রহণ করে তবুও বিরাট সংখ্যক শিশু নিজের খেয়ালখুশিতে অযত্নে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। এই পরিস্থিতিতে যুব অপরাধ মহামারী আকারে দেখা দেয়া অসঙ্গত নয়।

"আমাদের যুগের যুবক যুবতীরা দুর্দশার সঙ্কেত দিচ্ছে। তারা চায় আমরা তাদের সংকট অনুধাবন করি। যুব সংকটের প্রধান গতিগুলো নিম্নরূপ : ১। অভূতপূর্ব অস্থিরতার মধ্য দিয়ে সমাজবিরোধী আচরণ প্রবণতা ২। যৌন আচরণে বিশৃংখলা এবং বিকৃতি ৩। সবকিছুতে উত্তপ্তভাব এবং সর্বত্র এর সংক্রমন ও নতুন যে কোন কিছুর প্রতি অদম্য আগ্রহ ৪। পরিবারের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক, সঙ্গীদের সাহচর্যের প্রতি ঝোঁক, দুঃসাহস হারানো এবং সৃষ্টিশীল ক্ষমতা হ্রাস ৫। বর্জনের আগ্রহ, আশা ও বিশ্বাস হারানো, মোহমুক্তি এবং আদর্শের গতিশীলতা নষ্টজনিত হতাশা ৬। পরিবার ও সমাজের লক্ষ্যের সঙ্গে নিজের লক্ষ্যের সমন্বয় সাধনে ব্যর্থতা, পশ্চাৎগামিতা, অপ্রতিভ অবস্থা, নিজের পরিচয় খণ্ডিতকরণ এবং সবশেষে সামাজিক সম্মিলনে নিদারুণ বিশৃংখলা ও অরক্ষিত যুব মানসের আবেগময় পতন মানসিক অসুস্থতা*।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নারী মুক্তি সকলের জন্যে শক্তিশালী এবং অপরিহার্য হাতিয়ার প্রমাণিত হয়েছে। যতদূর সম্ভব গৃহকর্তী এবং মাতৃত্বকে আকর্ষণহীন, অসন্তুষ্ট ও অহেতুক প্রমাণিত করে মহিলাদেরকে বাড়ী থেকে বাহিরে আসতে প্রলুব্ধ করা হয়েছে। গণসংযোগ মাধ্যমগুলোতে চিরাচরিত নারীর ভূমিকা ছোট করে দেখানো এবং পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ মহিলাদের কাজকে আকর্ষণীয় প্রমাণিত করে এই কাজ করা হয়েছে। যে স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে সে পরিবার প্রধান হিসেবে স্বামীর কর্তৃত্ব নষ্ট করেছে। একইভাবে যে পরিবারে মা কর্তৃত্ব করে সে পরিবারের সন্তান পিতার ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে।

* Adolscent struggle as protest, nathan W ackerman. The voice of America forum lectures : The family series No. 6. Washingtion Dc. 1971.

ক্রমবর্ধমান অবৈধ যৌন স্বাধীনতাই সব চাইতে ক্ষতি সাধন করেছে। নারীর দেহকে বাণিজ্যিক রূপ দেয়ার কোন প্রচেষ্টাই বাকী রাখা হয়নি। অবিবাহিত মহিলাদের গর্ভধারণের সংখ্যা বৃদ্ধি, অবৈধ সন্তান, গর্ভপাত, তালাক, যৌন অপরাধ এবং যৌন ব্যাধি থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিকতায় আচ্ছন্ন দেশগুলোতে বহুবিবাহ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ এবং এজন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। অপরদিকে অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্যে কোন আইনগত শাস্তির বিধান নেই বরং এটাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বিবেচনা করা হয়।

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব থেকে বয়স্কদের জন্যে আশ্রয়হীনতার পথ প্রশস্ত হয়। জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন দেশগুলোতে বিশেষ যুব উৎসব, খেলাধুলা, সামরিক কুচকাওয়াজ এবং রাজনৈতিক বিক্ষোভকে যুবক যুবতীদের গৌরবের বিষয় মনে করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপে সুন্দরী প্রতিযোগিতা ও গণসংযোগ মাধ্যমগুলোতে যৌন আকর্ষণ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যৌবনের পূজা করা হয়। কম্যুনিষ্ট অথবা অকম্যুনিষ্ট যে দেশই হোক আধুনিকতায় আচ্ছন্ন হলে সেখানে বৃদ্ধদের সামাজিক মর্যাদা খুবই নীচ। বয়স্কদের প্রাচীন ও যুগের অনুপযোগী ভাবার শিক্ষা দিয়ে বিভিন্ন বয়সের লোকদের দ্বন্দ্ব প্রকটিত করা হয়।

আধুনিক যুবকেরা বয়স্কদের প্রতি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিকে নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্যে অপরিহার্য মনে করে। যারা অভিভাবকদের যত্ন করে তারা এটা অসহ্য বোঝা মনে করে। পর্যায়ক্রমে নার্সিং হোম অথবা হাসপাতালে রুগ্ন এবং অক্ষম বৃদ্ধদের জীবনকে অপ্রয়োজনীয় এবং সামাজিক দায় বলে মনে করা হয়। বয়স্ক লোকেরা নিজেদের বয়সের জন্যে লজ্জা অনুভব করা এবং যতদূর সম্ভব যৌবনকে ধরে রাখার চেষ্টা করা বিস্ময়কর কিছু নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহিলারা চুলে কলপ দেয়া, প্রসাধন এবং দেহের স্থুলত্ব কমাবার জন্যে কল্পনাতীত অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেন। পঞ্চাশ বছরের মহিলা বিশ বছরের যুবতীর দৈহিক গঠন না থাকায় নিজেকে অপরাধী মনে করে।

আজকের যুবকেরা জীবনের ভাল জিনিস থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় করে। তারা বার্ধক্য এবং মৃত্যুর ভয়ে আতংকগ্রস্ত। তারা যৌবনের হালকা

চাকচিক্যকে ধরে রাখতে চায়। তারা নিজেদেরকে বাহ্যিক দিক থেকে যুবক এবং আকর্ষণীয় রাখার জন্যে স্বর্গমর্ত ঘুরে মরে। তারা কাপড়, খাওয়া এবং প্রসাধনীতে মাতোয়ারা থাকে। তারা এই মশগুলভাবকে হাস্যাস্পদ পর্যায়ে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মহিলারা সাজগোছ, চুলে কলপ, পরচুলা পরা এবং মুখকে নতুনরূপ দেয়ার জন্যে ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করেন। যৌবনকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা এমন চরম পর্যায়ে পৌছেছে যে মা মেয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেয়েরা চীৎকার করে বলে 'আমি আমার মাকে মায়ের মত দেখতে চাই, বোনের মত নয়।' অপরিপক্কতার গুণ শুধুমাত্র কৈশোর পর্যায়ে নয় বরং মধ্যবয়স পর্যন্ত প্রসারিত করে।

আত্মকেন্দ্রিক এই প্রতিযোগিতা মানুষকে তার পরিবার, পরিবেশ এবং আত্মীয়স্বজন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করে যাতে পৃথিবীটা এক জঙ্গলে পরিণত হয় এবং প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে এই ধারণা জোরদার হয়। এই সুবিধাবাদী মনোভাব মানুষকে নিঃসঙ্গ, যান্ত্রিক এবং মানসিক গুণবর্জিত করে তোলে। ব্যবসায়িক দুনিয়ার মত পারিবারিক জীবনও লাভ লোকসানের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। অর্থ এবং প্রতিপত্তিকেই প্রভু বানানো হয়। মানুষকে বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মানবিক সম্পর্ক মানবেতর পর্যায়ে গিয়ে পৌছে। অপর পর্যায়ে প্রকৃত জিনিসের স্থলে বাহ্যিক আবরণকে মূল্য দেয়া হয়। তুমি কে সেটা নয় বরং তোমার চেহারা কেমন সেটাই বিচার করা হয়। মানুষের সম্পর্ক পোষাক এবং প্রসাধনের দ্বারাই নির্ণিত হয়। ক্ষমতা এবং প্রভুত্বের লক্ষ্য অস্বাভাবিক গুরুত্ব লাভ করে, পারিবারিক স্নেহ-প্রীতি, একতা, আনুগত্য, অংশীদারিত্ব, সহযোগিতা তার পদতলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়*।'

আধুনিকতার সবচেয়ে বড় গলদ হচ্ছে মানব জীবনের ব্যাপক ধারণা লাভে ব্যর্থতা। উদাহরণ হিসেবে নেয়া যায় ফ্রয়েডের মতে মানুষের স্বাস্থ্য এবং সুখ অবাধ যৌনজীবনের ওপর নির্ভরশীল, অপরদিকে মার্ক্সের মতে অর্থনীতিই মানুষের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু। সকল আধুনিকতাবাদীই চরম

* Adolescen struggle as protest, Nathan, W, Ackerman op cit. PP 8-9.

একমুখী মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। মানব জীবনের একটি দিক যৌন অথবা আর্থিক যাই-ই হোক না কেন তাকে সমগ্র মানব সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান করে ভেদ বুদ্ধিহীনভাবে অহেতুক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অপর কথায় বলা যায় জীবনের একটিমাত্র অংশকে সমগ্র জীবন মনে করে ভুল করা হয়েছে।

পশ্চিমী সভ্যতার এই দুর্ভাগ্য আকস্মিক বা মানুষের দুর্বলতার কারণে নয়। মানুষ মহৎ নীতি নিয়ে বাস করতে ব্যর্থ হয়েছে। মহৎ নীতিগুলো নিজেরাই অসম্পূর্ণ। পশ্চিমা সভ্যতা, মতবাদ এবং বাস্তবতা দু'দিক থেকে অনিষ্টকর। পশ্চিমা সভ্যতার পথ নির্দেশক দর্শনসমূহও এই দোষে দুষ্ট। ফলে সমগ্র ব্যবস্থাও এর প্রভাবমুক্ত নয়। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, পশ্চিমা সভ্যতা অনেক ক্ষেত্রেই মহত্ব অর্জন করেছে। অবশ্য এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, সত্যের আবরণেই মিথ্যা সব সময় অগ্রসর হয়। এখনো তার প্রকৃতরূপ ধরা পড়লে তা সম্পূর্ণই অন্ধকার মনে হবে।

সাংস্কৃতিক দাসত্ব রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়

যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের ঈমান এবং মানুষ হিসেবে আমাদের অনন্য পরিচিতির দিক থেকে বিদেশী রাজনৈতিক শাসনের চাইতে সাংস্কৃতিক অধীনতা অনেক বেশী ক্ষতিকর। তবে বাস্তবে সাংস্কৃতিক দাসত্ব রাজনৈতিক দাসত্বের সঙ্গে শুধুমাত্র সম্পৃক্তই নয় বরং সকল ইচ্ছা ও কাজে তা অবিভাজ্য। প্রায় ৬শ বছর আগে কৃতি মুসলমান ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তার মুকাদ্দীমায় এই সত্য স্বীকার করেছেন।

"বিজিতরা সব সময় বিজয়ীদের পোশাক, প্রতীক, বিশ্বাস এবং অন্যান্য আচার প্রথা অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। এর কারণ হচ্ছে মানুষ সব সময় বিজয়ীদের কাছে প্রিয় পাত্র হতে আগ্রহী হয়। এটা দুই কারণে হয় প্রথমতঃ বিজয়ীদের প্রতি শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়তঃ বিজয়ীদের মত যোগ্যতার অধিকারী হলে তাদের পরাজয় হতো না– এই মনোভাব হেতু যোগ্যতা অর্জনের জন্যে। এই বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হলে এটা একটা ব্যাপক আস্থার ভাব সৃষ্টি করে এবং বিজয়ীদের সকল কিছু অনুকরণে বিজিতরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস অজ্ঞাতভাবে অথবা বিজয়ের জন্যে বিজয়ীদের শারীরিক ও অস্ত্রের শক্তির চাইতে আচার আচরণ প্রাধান্য বিস্তার করেছে– এই বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হতে পারে। এই অবস্থায় তখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে বিজয়ীদের অনুকরণ পরাজয়ের কারণ দূরীভূত করবে। এইভাবে দেখা যায় বিজিতরা পোশাক, অস্ত্র ধারণ যন্ত্রপাতি এবং জীবন ধারণের সকল পদ্ধতিতে বিজয়ীদের অনুকরণ করে। বস্তুত প্রতিটি দেশই তার বৃহৎ বিজয়ী প্রতিবেশীকে অনুকরণের চেষ্টা করে। স্পেনের মুসলমানেরা বিজয়ী প্রতিবেশী খৃষ্টানদেরকে অনুকরণ করেছে। খৃষ্টানদের পোষাক, অলঙ্কার এবং আচার আচরণের বিভিন্ন দিক এমন কি ঘরে ছবি রাখার ব্যাপারে মুসলমানরা তাদের অনুকরণ করেছে। সযত্ন পর্যবেক্ষণে এই হীনমন্যতা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।"

ইবনে খালদুন মানুষের মনস্তত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তার সময়ের স্পেনিশ মুসলমানদের ন্যায় আজকের ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরাও অনুকরণ করছে। অবশ্য এটা ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় বিদেশী সভ্যতার অন্ধ ও সমালোচনাহীন অনুকরণ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। আমাদের বিদেশী প্রভুরা শাসনের প্রথম লগ্ন থেকেই খুব সতর্কতার সঙ্গে আমাদের জীবন পদ্ধতিকে ধ্বংস করে সেখানে তাদের আচার পদ্ধতি চালুর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তার ফলশ্রুতিতে অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাদের আচার প্রথা প্রবেশ করেছে।

প্রায় একশ বছর আগে বৃটিশ সরকার উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান এবং কার্যকরভাবে শাসনের নির্দিষ্ট পদক্ষেপের প্রস্তাব দানের জন্যে ডঃ উইলিয়াম হান্টারকে নিযুক্ত করেছিলেন। সেই হিসেবে ১৮৭১ সালে তিনি লিখলেন : আমাদের ভারতীয় মুসলমান : তারা কি রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বিবেকের কাছে বাধা! মুসলমানদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেলার জন্যে এবং তাদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিদেশী প্রভুত্ব মেনে নিতে শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করানোর জন্যে 'সবজান্তা' ডঃ হাণ্টার প্রস্তাব করেছেন ইংরেজী শিক্ষার।

তার বইয়ের সমাপ্তি পর্বে তিনি তার সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন। "এভাবে মুসলমান যুবকদেরকে আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষিত করে তুলতে পারি। তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এবং ধর্মশিক্ষার বিষয়ে সামান্যতম হস্তক্ষেপ না করেই আমরা তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারি যাতে করে তারা ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করলেও ধর্মান্ধ হবে না। বিশ্বের অন্যতম চরম গোঁড়া সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা যেভাবে সহনশীলতার শিক্ষা পেয়েছে, মুসলমানদেরকেও সেই পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহিত করা যেতে পারে। অনুরূপ সহনশীলতা মুসলমানদেরকে তাদের পূর্ব-পুরুষদের গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করে আনবে, যে গোঁড়ামী তাদেরকে নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা ও অপরাধজনক কাজের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। আর এসবই তারা করে এসেছে ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে। মুসলমানী আইনশাস্ত্র আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নিয়মিত পড়ানো হবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু এটাকেই শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হিসেবে ধরে

নেয়া ঠিক হবে না। মুসলমানী আইন মানে মুসলমানী ধর্ম, মুসলমানরা সমগ্র পৃথিবীতে তাদের আইনানুগ অধিকারে বিশ্বাসী। তারা আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব আনুগত্য অথবা খৃষ্টান সরকারের অধীনতার কথা জানে না। মুসলমানী আইন সরকারের কোন প্রয়োজন এবং জীবন সম্পর্কে তার ছাত্রদেরকে কোন ধারণা দেয় না। এর পরিবর্তে আমাদের উচিৎ একটা উদীয়মান মুসলিম জাতি গড়ে তোলা যারা নিজস্ব সংকীর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি ও মধ্যযুগীয় ভাবধারার গণ্ডীতে আবদ্ধ না থেকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের নমনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। ইংরেজী প্রশিক্ষণ জীবনের লাভজনক অধ্যায়ে প্রবেশের নিশ্চয়তা দেবে। কোন্ পদ্ধতি প্রবর্তনের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানদের সমভাবে উচ্চতর ধর্মীয় ধারণায় উন্নীত করা সম্ভব সে সম্পর্কে আমি এখানে কিছু বলতে চাই না। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে অনুরূপ উন্নত অবস্থায় তারা একদিন উপনীত হবে এবং এতদিন নেতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে এ বিষয়ে প্রাথমিক পদক্ষেপ।"

ডঃ হান্টারের ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হয়েছে এবং আজ আমরা তার ফল ভোগ করছি। বংশ পরম্পরায় পাওয়া সেই সম্পত্তি ৪৭ এর স্বাধীনতার পরও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় এখনও বহাল রয়েছে। বৃটিশ শিক্ষা পদ্ধতি এতই দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে যে, সমগ্র উপমহাদেশে আধুনিকতা তথা ধর্মনিরপেক্ষতার বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের মোকাবিলা করার জন্যে পর্যাপ্ত ইসলামী জ্ঞান দানে সক্ষম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কোথাও নেই। আমাদের যুবকেরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোন আকর্ষণ ছাড়াই বড় হচ্ছে। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে Lord cromer ছিলেন আরব বিশ্বের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত পঁচিশ বছর প্রতিবন্ধকতাহীনভাবে তিনি মিশর শাসন করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৌশল জানার জন্যে তার বিরাট বই Modern Egypt অপরিহার্য। বই এর সমাপ্তিতে তিনি কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেননি যে, সরাসরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের চাইতে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের নীতিই ছিল তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

"কোন বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতিকের চিন্তা করা ঠিক নয় যে, ইসলামকে পুনর্জীবন দানে সক্ষম– এমন পরিকল্পনা তাদের রয়েছে, বস্তুতঃ ইসলাম এখনো মরে যায়নি, বরং শতাব্দী ধরে টিকে থাকার যোগ্য। তবে রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে তা মৃতপ্রায়, তার ক্রমাগত অবনতি কোন আধুনিক তত্ত্ব প্রয়োগে, তা যতই দক্ষতার সঙ্গে করা হোক না কেন ঠেকানো যাবে না। এই পর্যন্ত যতটুকু বিচার করা যায় তাতে দু'টি মাত্র বিকল্প পন্থা সম্ভব। মিশরকে পর্যায়ক্রমে স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে নতুবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই দুই বিকল্পের প্রথমটির পক্ষে। আমরা যা করব তাতে ভাল, জোরদার এবং স্থিতিশীল সরকারের ব্যবস্থা করতে হবে যা অরাজকতা এবং দেউলিয়াত্ব দূর করে মিশরকে ইউরোপের জন্যে সমস্যায় পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। এ ধরনের সরকারের কাজে আমাদের বেশী মাথা ঘামানো উচিৎ নয়। তবে আমাদের বিদায়ের পর সরকারকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যা পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ..... এটা মনে করা ঠিক হবে না যে মিশরে সম্পূর্ণ মুসলমানী নীতির ওপর প্রাচীন চিন্তাধারা ও পশ্চাদগামী সরকার প্রতিষ্ঠার সময় ইউরোপ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে। মিশর যে পর্যায়ে পৌছেছে তাতে ঐ ধরনের চিন্তাধারা অনুসৃত হলে বস্তুগত স্বার্থের সাংঘাতিক ক্ষতি হবে।

যারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চান এবং সমস্যার সমাধান চান তাদেরকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মিশরের নতুন বংশধর পশ্চিমা সভ্যতা সত্যিকারভাবে অনুসরণ বা গ্রহণে বাধ্য হয়। আমার বিশ্বাস ইংল্যাণ্ডের সুমহান পরিচালনায় পশ্চিমা সভ্যতার রশ্মি কৃষ্ণ আফ্রিকার সবচাইতে দুর্ভেদ্য স্থানে গিয়ে পৌঁছুবে এবং এমনকি মিশরের ক্লেদাক্ত কৃষকেরা ও তাতে নতুন জীবন লাভ করবে। মিশরীয়দের অজ্ঞতা এবং অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও আমি এখনো আশা করি বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবে যে, Anglo-saxon জাতির লোকেরা প্রথম তাদের অত্যাচারী কৃতদাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে, তারা তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যে, তারাও মানবিক আচরণ পাওয়ার অধিকারী, তারা তাদের

সামনে নৈতিক অগ্রগতি এবং চিন্তার স্বাধীনতা ও বস্তুগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পথ উন্মুক্ত করে খুলে দিয়েছে পশ্চিমা সভ্যতার সত্যিকার মহাসড়ক।"

এটাই ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল লক্ষ্য, স্বাধীনতার পরও কেন আমাদের ওপর বিদেশী প্রভাব এত জোরদার তার জবাবও এই বৃটিশ শাসকের উক্তি থেকে পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ সকল প্রচারণা সত্ত্বেও আমাদের স্বাধীনতা একটা সামান্য ব্যাপার মাত্র। দীর্ঘদিন আমাদের দেশ বিদেশী শাসনাধীন ছিল, আমাদের জনগণকে অতীত ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে বিদেশী প্রভুরা খুব যত্নের সঙ্গে সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এইভাবে তারা সাফল্যের সঙ্গে বিশেষতঃ সামাজিক দিক থেকে প্রাজ্ঞ লোকদের মধ্য থেকে একদল সাক্ষী গোপাল ও গৃহশত্রু বিভীষণ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়ার পর আমাদের নেতৃত্ব এই পশ্চিমা চক্রের হাতে গিয়ে পড়ে।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে এই নেতৃত্ব অব্যাহত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। কারণ আমাদের জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই তাদের ধ্যান-ধারণা এবং তাদেরকে ঘৃণা করতো এই কারণে গণতান্ত্রিক পন্থায় পশ্চিমা সভ্যতার বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই জন্যে খুবই শক্ত হাতে একনায়কত্ব চাপিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হলো। যারা এর বিরোধীতা করলো তাদেরকে নির্দয়ভাবে নিশ্চিহ্ন করা হলো। এমনকি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের জনগণকে দেয়া গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা মুসলমানদের দিতে রাজী হবে না, কারণ তারা ভাল করেই জানে মুসলমানদের মনে ইসলামের প্রভাব খুবই জোরদার, গণতান্ত্রিক রায় প্রকাশের সুযোগ একবার আসলেই সকল মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আর এই অবস্থা হলে এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের প্রভুত্ব চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে যাবে। এই জন্যে ইসলামী আন্দোলনকে তাদের বিরাট ভয়, বিশ্বব্যাপী তাদের সংগঠিত সকল চক্রান্তের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনকে শেষ করা।

রাজনৈতিক দাসত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অর্থনৈতিক দাসত্বকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, বরং বলা যায় অর্থনৈতিক দাসত্বই আমাদের এই পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য করেছে। অর্থনৈতিক

উন্নয়নের নামে বৃহৎ শক্তিবর্গ বিদেশী সাহায্যের টোপ গেলাতে উৎকণ্ঠিত। উচ্চ হারে সুদ নিয়ে এই সাহায্য শেষ পর্যন্ত গ্রহীতা দেশকে ভিক্ষুকে পরিণত করে। এতে কোন অতিশয়োক্তি নেই যে, পশ্চিমা বিরাট বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো তাদের সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের প্রধান মাধ্যম। অনুন্নত (এখন উন্নয়নগামী) মুসলিম দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে পর্যায়ক্রমে বিরাট বিরাট বিলাসবহুল ভবন, অত্যাধুনিক কারুকার্যের হোটেল, শহরের রূপ পাল্টিয়ে দেয়।

ব্যবস্থা হয় নৈশ ক্লাব এবং ক্যাবারে নাচের। হলিউড থেকে অপরাধমূলক ও অবৈধ যৌন সংসর্গের জঘন্য ছবি আসে, তার অনুকরণে দেশে ছবি নির্মিত হয়, পর্ণ ছবি, পুস্তক এবং বিদঘুটে পোশাক এসে বাজারে সয়লাবের সৃষ্টি করে যা সামাজিক উৎকর্ষতার চূড়ান্ত বিকাশ বলে বিবেচিত হয়। খাদ্যে ভেজাল দেয়া আমাদের শরিয়তে বিরাট পাপ বলে গণ্য হলেও এই পরিবেশে তা দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং অন্যের জীবন ও স্বাস্থ্যের বিনিময়ে ভেজালদানকারী দিনে দিনে প্রাচুর্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার অস্বাভাবিক বেড়ে যায়, আমাদের বেতারগুলো কদর্য ও নগ্ন গানের দ্বারা সাধারণ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

বিদেশী প্রভাবিত শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থায় পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করিয়ে মেয়েদেরকে চাকুরীতে নেয়া হয়। এই ভাবে আমাদের মহিলারা স্ত্রী, মা, বোন এবং কন্যার পবিত্র আসন থেকে বাস ট্রেনের টিকেট সংগ্রাহক, ব্যাংকের কেরানী, টেলিফোন অপারেটর, সেলস গার্ল, বিমানবালা, রেস্তোঁরার ওয়েট্রেস, হোটেলের কক্ষ সেবিকা, ফেশান মডেল এবং বেতার, টেলিভিশন, ছায়াছবি ও রাষ্ট্র আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গায়িকা ও নর্তকীতে পরিণত হয়। এই ভাবে পর্যায়ক্রমে পর্দা, বাড়ী, পরিবার অবৈধ যৌন সংসর্গের জোয়ারে ভেসে যায়। যুবক যুবতীরা একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে গড়ে উঠে। এইসব ব্যাপার আকস্মিকভাবে হয় না। বরং আমাদের ওপর যারা প্রভুত্ব বজায় রাখতে চায় তারা খুবই সতর্কতা ও দক্ষতার সঙ্গে আমাদের জীবন প্রবাহে এ সবের অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়। আমাদের শত্রুরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে আমাদের অধঃপতন ঘটিয়ে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে ছোট করতে চায়। তাদের

স্বার্থেই আমাদের অধঃপতন ঘটুক আমাদের দেশ দুর্নীতিতে ভেসে যাক এটাই তাদের কাম্য।

এই ভীতি কার্যকরভাবে মোকাবিলার জন্যে আমাদেরকে বুঝতে হবে রাজনৈতিক দাসত্ব আর সাংস্কৃতিক দাসত্ব কেন অবিচ্ছেদ্য, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে হবে যে, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া সত্যিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। বিরোধী এবং বিদেশী শাসনের অধীনে ইসলামের উৎকর্ষ অসম্ভব। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমাদের ইসলামী পুনর্জাগরণের সকল আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানাতে হবে এবং আমাদের সরকার যাতে আইন হিসেবে ইসলামের নির্ভেজাল শরিয়তকে গ্রহণ করে সে জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। ইসলামী আন্দোলনকে সকল গণসংযোগ মাধ্যমের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে।

কোন বিদেশী শক্তি যাতে আমাদের ভূখণ্ডে সামরিক ঘাঁটি করতে না পারে তার তীব্র বিরোধিতা করতে হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে আমাদের সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব সম্পদ ও বন্ধু মুসলিম দেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হবে। প্লেগরূপী বিদেশী সাহায্য অবশ্যই পরিহার করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনে, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে আমাদেরকে সমঅংশীদার হিসেবে সৎ ব্যবসার ওপর জোর দিতে হবে। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ সব সময় ইসলামকে তাদের শক্তিশালী শত্রু জ্ঞান করে আসছেন ফলে তাদের নতুন বংশধরেরা একই দৃষ্টি ভঙ্গিতে ইসলামকে অধ্যয়ন করে থাকে।

পশ্চিম ইউরোপ থেকে উদ্ভুত বস্তুবাদী দর্শনই প্রতিটি মুসলিম দেশে ইসলামী জীবন পদ্ধতি পুনরুজ্জীবনে সব চাইতে বড় বাধা হয়ে আছে। এই কারণে আমাদের কিছু উলেমাকে পাশ্চাত্যের অধিবাসী হয়ে ইউরোপের সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম এবং দর্শন পড়তে হবে যাতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নত দর্শন উপস্থাপন করা যায়। এই ভাবে সকল দিক থেকে আমাদেরকে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করতে হবে যাতে আমাদের ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি করে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারি।

ইসলাম কি বিশ শতকীয় ধারণার সঙ্গে আপোষ করতে পারে ?

'আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারলে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে'। প্রতিটি মুসলিম দেশের আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদের মুখে বারবার একথা শোনা যাচ্ছে। তারা সব সময় আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমরা অতিক্রান্ত যুগের ধ্যান ধারণা নিয়ে বাঁচতে পারি না। আমাদেরকে শেখানো হচ্ছে যে, ঘড়ির কাঁটা পেছনের দিকে ঘোরানো অবাস্তব, কারণ ইতিহাসের গতি কেউই পরিবর্তন করতে পারে না। অতএব ক্রম পরিবর্তনশীল ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের সঙ্গে ঈমানকে খাপ খাওয়ানো ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই। শক্তিশালী হওয়ার জন্যে আমাদেরকে কোরআনের চিরাচরিত ব্যাখ্যা বর্জন করতে হবে এবং আধুনিক জীবনের আলোকে যুক্তিসঙ্গতভাবে তা অধ্যয়ন করতে হবে। মুসলিম দেশের সরকারসমূহ নিজেদের লক্ষ্য অনুযায়ী ইসলামের সংস্কারের সুপারিশ করেছেন। আমরা এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ এবং ইসলামী সম্প্রদায়ে তার ফলাফল খতিয়ে দেখব।

সুবিধাবাদের দ্বারা প্রভাবিত দুনিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্র ধর্মযাজকমণ্ডলীর অভিসম্পাতগ্রস্ত বস্তু। আধুনিক শিক্ষিত নেতারা আমাদেরকে খেলাফতের ধারণা সম্পূর্ণ বিলোপ করে ভবিষ্যতে এর পুনরুজ্জীবনের সকল দ্বার রুদ্ধ করে দেয়ার পরামর্শ দেন। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং সরকারকে 'মধ্যযুগীয়' খেতাবে ভূষিত করা হয়। অতএব আধুনিক বিশ্বে স্থান পাওয়ার জন্যে মুসলমানদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের সঙ্গে আপোষ করতে হবে। এই যুক্তির সারবত্তা প্রমাণের জন্যে আমাদের সকল অনিষ্টের মূলে খেলাফতকে দায়ী করে মুসলিম দেশসমূহে পুস্তক[১] লেখা হয়েছে। দাবী করা হয়েছে যে, খেলাফত ইসলামের অংশ নয় কারণ মহানবীর মিশন ছিল

১. Islam and Principles of govt (Al-Islam wa usul Alhukm) Ali Abd Al Raziq, Cairo, 1925 from here we start (min Huna Nabda) Khalid Mohmad Khalid, Cairo, 1950.

কেবলমাত্র প্রচারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি কখনো শাসনের ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। কেবলমাত্র অপরিহার্যতা তাকে বাধ্য করেছিল। বুদ্ধিবৃত্তিক অসাধুতা পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিল। ইসলামী সমাজ ছাড়া ইসলাম বাঁচতে পারে না এবং ইসলামী সমাজ সুসংগঠিত নেতৃত্ব ছাড়া সম্ভব নয়।

আমাদের আধুনিক শিক্ষিতরা শরিয়তকে যুগের অনুপযোগী এবং এর বিচার পদ্ধতিকে পশ্চিমা বিচার পদ্ধতির চাইতে নিম্নমানের মনে করেন। তাদের মতে কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ আইনই সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে।[২] অবৈধ যৌন সম্পর্ক, মদ্যপান, জুয়া এবং সুদে টাকা ধার দেয়ার জন্যে কোরআন ও সুন্নাহর আরোপিত শাস্তিকে নিষ্ঠুর এবং অমানুষিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আইনের শিথিলতা থেকেই কি তার গুণাগুণ বিচার্য? অপরাধীরা কি সমাজের চাইতেও বেশী সহানুভূতি পাওয়ার অধিকারী? আইনের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া নৈতিক মূল্যবোধ কি শীগগীরই ফাঁকা উক্তিতে পরিণত হয় না?

বর্ণ, ভাষা এবং ভৌগলিক পার্থক্যের উর্ধে ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রাধান্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। এই কারণে একে বিশ শতকের ধ্যান ধারণার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্যে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত নেতারা উম্মাতের স্থলে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ[৩] কে গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর ফলে বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে। অভিন্ন ইসলামী ঐতিহ্যের পরিবর্তে আমাদের নেতারা পৌরাণিক ঐতিহ্যের ওপর জোর দেন, ভাবখানা এমন যে তা ছিল স্বর্ণযুগ, ইসলাম আমাদেরকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এই কারণে তুর্কী জাতীয়তাবাদীরা ওসমানীয় যুগকে বিদেশী সংস্কৃতি ও ভাষার আধিপত্য বলে ঘৃণা করেন এবং একই ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে রেজা শাহ পাহলভী আর্যসম্প্রদায়ের কথিত আবাসভূমি হিসেবে 'পারস্যকে' 'ইরানে' রূপান্তরিত করেন।

---

২. A Modern Interpretation of Islam, Asaf Ali Fyzee, Asia Publishing House, Bombay, 1963.

৩. Turkish nationalism and Western civilization, Ziya gokalp, Columbia university Press, New York, 1859.

আরবী মূল পাঠ ছাড়া কোরআনের আনুষ্ঠানিক অনুবাদের জন্যে অব্যাহত চীৎকারের পিছনেও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা কাজ করেছে। তুরস্ক, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় ল্যাটিন হরফ চালু এবং অনারব মুসলিম দেশে আরবীকে অবজ্ঞা করে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য, চলিত ভাষার পরিবর্তে সর্বোকৃষ্ট ভাষা প্রচলনের জন্যে আরব জাতীয়তাবাদীদের দাবীকে জোরদার করেছে। এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে কোরআনের ভাষাকে ক্রমেই অস্পষ্ট করে তুলছে। আরবী মূল পাঠ ছাড়া কোরআনের অনুবাদ শুধুমাত্র উম্মাৎকেই ধ্বংস করবে না উপরন্তু (খোদা না করুন) মূল পাঠকেও বিকৃত করবে।

প্রতিটি মুসলিম দেশেই যারা কর্তৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে থাকেন তারা দুনিয়ার সঙ্গে সকল প্রতিযোগিতার জন্যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা ভাল মন্দ বিচার না করে আধুনিক সভ্যতার সকল অবদানকে গ্রহণের জন্যে জোর দেন। অন্য কথায় তারা বোঝাতে চান যে, আমাদের সমাজকে শক্তিশালী করতে হলে কোন প্রকার বাছবিচার ছাড়াই জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্যে বিদেশী কারিগরি 'সাহায্য' কর্মসূচী, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়ণ করে দারিদ্র, রোগ ও নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। যারা মনে করেন যে, আমরা কেবলমাত্র আধুনিক সভ্যতার ভাল দিক গ্রহণ করব এবং খারাপ দিক বর্জন করব তাদের মনে রাখা উচিৎ যে প্রত্যেক সভ্যতারই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। কোন সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিককে পৃথক করা যায় না বরং তার একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল।

এই কারণে কোন সভ্যতার বাস্তব সাফল্য তার মৌলিক চরিত্রের প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। আধুনিকতাবাদের শিষ্যরা এতই অর্থনৈতিক বাতিকগ্রস্ত যে, অর্থনীতিই তাদের বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। পরকালকে অস্বীকার করার ফলে মার্কিন এবং ইউরোপীয়রা তাদের সকল প্রচেষ্টা স্বাস্থ্য ও দৈহিক আরাম আয়েসের জন্যে ব্যয় করে। পার্থিব সমৃদ্ধির জন্যে পর্যায়ক্রমে তারা এক্ষেত্রে সকল মানুষকে পশ্চাতে ফেলে যায়। ইসলাম সহ অন্যান্য সভ্যতা কখনও এই সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এর কারণ নীতিগতভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অস্বীকার নয় বরং জীবনের অন্যান্য দিককে তারা আরও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সেদিকে দৃষ্টি দেয় বলে।

মুসলিম নারী মুক্তিকে সামাজিক অগ্রগতির জন্যে অপরিহার্য[৪] মনে করা হয়। নারীত্ববাদীরা নারী মুক্তি বলতে অত্যাধুনিক ফ্যাশন অবলম্বন, ঘরের বাইরে চাকুরী নেয়া, পরিবার ও বাড়ীর সঙ্গে অনিবার্য সম্পর্কচ্ছেদের মাধ্যমে জনজীবনে পূর্ণ অংশ গ্রহণকে বুঝিয়ে থাকেন। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি সরকার পাশ্চাত্যের পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণকে উৎসাহিত করেন। তুরস্ক আইনের মাধ্যমে পশ্চিমা পোশাক গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে এই ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। পশ্চিমা পোশাককে প্রগতি ও অগ্রগতির প্রতীক এবং চিরাচরিত পোশাককে পশ্চাৎপদতার চিহ্ন আখ্যায়িত করা হয়। এই পোষাক ক্রমেই গ্রামের গরীব জনগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মুসলমানিত্বের দৃষ্টিগোচর চিহ্নকে বর্জন এবং ইসলাম বিরোধী সভ্যতার পোশাক, কারুকার্য এবং জীবন পদ্ধতি গ্রহণ স্বধর্ম ত্যাগের নামান্তর[৫]। আমাদের মহানবী বেঈমানদের অনুকরণকারীদের নিন্দা করার সময় এ বিষয়ের ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করতেন।

এইভাবে আমরা দেখেছি যে, কেন বিশ শতকীয় প্রেরণার সঙ্গে ইসলামকে খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয়। আমরা মুসলমানরা আধুনিক জীবনের সঙ্গে ইসলামকে খাপ খাওয়ানোর যতই চেষ্টা করব ততই দুর্বল হয়ে পড়ব। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নয় বরং সময়ের প্রতিকূলে লড়াই করেই আমরা শক্তিশালী ও জোরদার হবো।

---

৪. The new woman, Qassim Amin bey, cairo 1901.

৫. Islam at the Cross Roads, Mohammad Assad, Lahore 1904. Nationalism and India, Maulana Maudoodi, Pathankot 1939.

আধুনিকতার গলদ

মুসলমান জনসমাজে আধুনিকতাবাদী বলতে এমন লোককে বোঝায়, যে হযরত মোহাম্মদ (সা) থেকে আগত এবং সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত ইসলামের প্রতি বিরাগভাজন এবং ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার কোন দ্বন্দ্ব নেই বলে প্রমাণে সচেষ্ট হন। নামে মুসলমান হলেও আধুনিকতাবাদী ইউরোপীয় ধ্যান ধারণার আলোকে ইসলামকে বিচার করেন। ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তার মনের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। ইসলামের যা কিছুই ইউরোপীয় আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন তাই বাতিল করার পক্ষে তিনি ওকালতি করেন।

"আমরা জানি আন্তর্জাতিক জগৎ, বিশেষ করে পশ্চিমা খৃষ্টীয় জগত আমাদের দেশে কি ঘটতে যাচ্ছে তা দেখার জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে। আমরা এখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তাদের বিরাট ভয়; বেঈমানদের বিরুদ্ধে জেহাদ পুনঃপ্রচলন ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্ভাবনাসহ ইসলামী দেশসমূহে আল্লাহতন্ত্র চালু হবে। যদি আমরা একদিকে পশ্চিমাদেরকে আশ্বাস দেই যে আমরা তাদের বিপদের কারণ হবো না অপর দিকে আমরা দেশে কি করব সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে হবে।* আমাদেরকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্যে দেশে পশ্চিমা সভ্যতাকে প্রচলন করতে হবে।

শেখ মোহাম্মদ আবদুহুর শিষ্য এবং কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর (১৯২৭-২৯/১৯৩৫-৪৫) মোস্তফা আল-মারাগী কতিপয় আমেরিকান মুসলমানদের জন্যে দেয়া এক বার্তায় আধুনিকতাবাদীদের আদর্শ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

* Philosophy and Ideology, Hazi Agus Salim, Former Foreign Minister of Indonesia, The light organ of the Ahmedia movement, Lahore, September 8, 1967.

"এইসব লোক ইসলাম সম্পর্কে পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করেছেন। আমি আশা করি তারা কখনো ইসলামী দেশ সফর করবেন না এবং আমরা যে কার্পণ্য, অজ্ঞতা, একগুয়ে এবং অনগ্রসরতা প্রদর্শন করি তা দেখতে পাবেন না* ।"

কানাডীয় একজন মুসলমান একই পুস্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে আমার কাছে যে চিঠি লিখেছেন তাতেও একই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "আল্লাহ্ আমাকে একজন ককেশীয়, একজন কানাডীয়, বিশ শতকের একজন মানুষ হিসাবে তৈরী করেছেন এবং তিনি আমাকে মুসলমানও করেছেন। যদি আমি কালো, অপরিচ্ছন্ন, অশিক্ষিত বেদুঈন হতাম, যারা তাদের পূর্ব পুরুষের ন্যায় বসবাস করে তাহলে মরে যেতাম। যদি ইসলাম পরিপূর্ণভাবে অমুসলিম দেশে টিকে থাকার অযোগ্য হতো, যদি একজন মুসলমান পশ্চিমা হতে না পারতো, আধুনিক অথবা পশ্চিমা আধুনিকতা গ্রহণ করতে না পারতো খৃষ্টীয় পরিবেশে উন্নতি করতে না পারতো তাহলে এই ধর্ম মরুভূমির বাসিন্দাদের জন্যেই উপযুক্ত হতো- যেখান থেকে তার আবির্ভাব ঘটেছে।"

আধুনিকতাবাদীরা শুধু জোরের সঙ্গে নিজেদের মুসলমানিত্ব প্রচার করেই ক্ষ্যান্ত হয় না উপরন্তু নিজেদেরকেই সর্বোত্তম এবং সত্যিকার মুসলমান বলে দাবী করে। তাদের বিরোধিতাকারীদের প্রতিক্রিয়াশীল একগুয়ে অথবা অসংস্কৃত বলে আখ্যায়িত করে। তাদের মধ্যকার আদর্শবাদী এবং উচ্চমনারা বিভ্রান্তি প্রচার করে বেড়ান যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধুনিকতার আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা করে কেবলমাত্র তারাই একে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।জীবন সম্পর্কে দুটি বিরোধী দর্শনের দুঃখজনক সংঘর্ষের সমাধান করতে গিয়ে তারা অসামঞ্জস্যকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধরে আত্মপ্রবঞ্চনায় অস্বাভাবিক মাত্রায় মেতে উঠেন। পাঠকদের আধুনিকতাবাদীদের সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়ার জন্যে ইসলামের ইতিহাসের বহুল অপব্যাখ্যার কিছু নজির তুলে ধরা হলো।

---

* Quoted from "The Re-Evaluation of Islam in Turkey" Fareed S. Jafri, The Pakistan times, Lahore, 1967.

১। আধুনিকতাবাদীদের মতে আমাদের মহানবী ও খেলাফতের সময় ইসলাম ছিল খুবই উদার, প্রগতিশীল এবং যুক্তিনির্ভর ধর্ম। কিন্তু আমাদের ইমাম, কাজী, ঐতিহ্যবাদী ও ধর্মতত্ত্ববিদদের হাতে ইসলাম সেকেলে অযৌক্তিক, সংকীর্ণ, অচল ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে, যা আমাদের বর্তমান দুর্বলতা এবং অবমাননার জন্যে দায়ী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিকতাবাদীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মুসলিম বিশ্বের সকল অনিষ্টের মূলে রয়েছে উলেমা এবং ধর্মীয় পন্ডিতেরা। তাদের একজন লিখেছেন, "সৌদী আরব থেকে মৌরিতানিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত প্রতিটি মুসলিম দেশের জনগণ আজ শুধু মাত্র বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছে। মোল্লারা এই অবনতির জন্যে পশ্চিমা প্রভাবকে দায়ী করবেন। তারা ভুলে যান যে, যে সব যায়গায় এখনও পশ্চিমা প্রভাব পড়েনি সেখানেও ইসলামের করুণ অবস্থা দৃষ্টি গোচর হয়। তারা কি এই সত্য অস্বীকার করতে পারবেন যে, পশ্চিমা প্রভাব যেখানে যায়নি সেগুলোই হচ্ছে সব চাইতে খারাপ এবং পশ্চাৎপদ এলাকা।

অপরদিকে সেখানে শতাব্দী ধরে মোল্লারা ধর্মীয় কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে আসছে। এটা তাদের জন্যেই হয়েছে যারা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে ইসলামকে অবাধে মিশে যেতে না দিয়ে নিশ্চল করে রেখেছে। মুসলিম বিশ্বের সকল দুর্যোগ থেকে মুক্তির জন্যে আমাদেরকে যুক্তি মানেন না এমন লোকদের দেয়া কোরআনিক ব্যাখ্যা ভুলে যেতে হবে। যখন আমরা নিজেরা কোরআন বুঝতে চেষ্টা করব, তখন আমরা ইসলামকে রক্ষা করতে পারব, আমাদের নারীদেরকে ১৪শ' বছরের অবমাননা থেকে রক্ষা করতে পারব এবং আমরা তাদেরকে স্বাধীনতা ও সাম্যের রাজপথে দাঁড় করাতে পারব। প্রেমের দ্বারা ধর্মের অনুশীলন চলবে, জোর করে নয়। জীবন একঘেয়েমী মুক্ত হবে, প্রার্থনার সঙ্গে খেলাধূলাও চলবে এবং আমরা স্বচ্ছ হীরার ন্যায় ইসলামের মর্মার্থ উপলব্ধি করব।*

* The need for Re-Evaluation of Islam in Pakistan, Fareed S. Jafri, Pakistan times, Lahore, August 11, 1967.

অপর কথায় আমাদের প্রিয় নবীর জীবদ্দশা থেকে এখন পর্যন্ত মুসলমানরা ইসলামের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করছেন। কেবলমাত্র তখনকার পশ্চিমা সভ্যতায় প্রভাবিত আধুনিকরা সত্যিকার অর্থে ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভ করেছেন। বোখারী, মুসলিম, আবু হানিফা, শাফেয়ী, মালিক, আহামদ ইবনে হাম্বল, আল-গাজ্জালী এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মত যুক্তিহীন পন্ডিতেরা সবাই ভুল করেছেন এবং যতদিন মুসলমানেরা এদেরকে শ্রদ্ধা করার পরিবর্তে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের মত লোককে শ্রদ্ধা করতে না শিখে ততদিন আমাদের মুক্তি নেই।

২। আধুনিক জীবনের সঙ্গে সংঘাতময় ইসলামের এমন সব চিরন্তন নীতি ও আইন কানুন পৃথক করে নিতে হবে। এগুলো নবীর যুগের প্রাথমিক অবস্থার জন্যে ছিলো যা আমাদের মত অগ্রসর সমাজের জন্যে অবান্তর এবং অযোগ্য, সুতরাং এগুলো বাদ দিতে হবে। এমন কি নামাজ, রমজানের মাসে রোজা, যাকাত এবং হজ্বের মত প্রশ্নাতীত অপরিহার্য এবাদতও এমন শিথিল ও নমনীয়ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে এগুলো পালনের বাধ্যবাধকতা না থাকে।

৩। মধ্যযুগের ইউরোপের সাংস্কৃতিক জীবনে মুসলমানদের এতই উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে যে তাদের ছাড়া আজকের আধুনিক সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হতো না। অপর কথায় ইসলাম ছিল পশ্চিমা সভ্যতার জনক। পশ্চিমা সভ্যতা তারই নীতি ও মূল্যবোধের আরও উন্নত সংস্করণ। যদিও মুসলমান নামধারী নয় পশ্চিমা সভ্যতার অনুসারীরা মুসলমানদের চাইতেও সত্যিকার ইসলামী প্রেরণায় উজ্জীবিত। এই কারণে মুসলমানেরা আধুনিক সংস্কৃতি গ্রহণ করে প্রকৃত উত্তরাধিকার ফিরে পেতে পারে।

আমাদের মহানবী এবং তার সাহাবীদের উদারতা প্রগতিশীল মনোভাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে এরা এমন ভাব দেখায় যে,তারা ইসলামের কোন একক দিক নয় বরং তাদের কাংখিত উপায়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামই তারা পেতে চায়। সীমাহীন খোদা ভীতির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিতকারী আমাদের

ইমামদের সম্পর্কে তাদের আত্মপ্রাসাদপূর্ণ অনুমান আমাদের লোভের কারণ। তারা ইসলামের যে ব্যাখ্যা করেছেন নাস্তিক ও বস্তুবাদী লোকদের ব্যাখ্যাকে তার চাইতে উন্নত জ্ঞান করে আধুনিকতাবাদীরা ইসলাম ভক্তির কি হাস্যকর পরাকাষ্ঠাই না দেখান।

ইসলামের চিরন্তন পবিত্র নীতির প্রতি তাদের কপট ভক্তি শ্রদ্ধা অবিশ্বাস ও সরাসরি অস্বীকারকে গোপন করারই হীন প্রচেষ্টা মাত্র। সুযোগ পেলে তারা কোন কিছুই বাদ দিতেন না। আধুনিকতাবাদীদের মতানুযায়ী স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের যদি স্বাভাবিক অস্তিত্ব না থাকে এবং জোর করে ভিন্ন মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ছাড়া যদি নিজস্ব কোন গুণাগুণ না থাকে তাহলে ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ বা আদৌ মুসলমান থাকার কোন প্রয়োজন আছে কি?

ইসলাম ও সমসাময়িক বিরুদ্ধ মতাদর্শ

'বিরুদ্ধ মত' শব্দটা আজ এতই অপ্রিয় যে, যে কেউ কোন ব্যক্তি বা ধারণার বিরুদ্ধে তাকে আনতে চাইলে আমাদের 'আলোকপ্রাপ্ত উদার নীতিকরা' তাকে গোঁড়া এবং ধর্মোম্মাদ বলে আখ্যায়িত করেন। প্রাচীন ধর্মমতের আমন্ত্রণকে যতই গালাগাল দেয়া হোক না কেন যেখানে তার আমন্ত্রণ অপরিহার্য এবং যুক্তিসংগত সেখানে তার আগমন ঠেকিয়ে রাখা যায় না। খৃষ্টান মিশন এবং পশ্চিমা প্রাচ্যবিদরা আমাদের জন্যে জোড়াতালি দেয়া নতুন ধরনের ইসলাম চালুর প্রচেষ্টায় আমাদের দেশীয় আধুনিকতাবাদীদের পূর্ণ সমর্থন করেন।

ডঃ কেনেথ্ ক্র্যাগ তার 'কল্ অফ দি মিনারেট' এ বলেছেন, "ইসলামের আবির্ভাবকালে অনৈসলামী ভাবধারা প্রতিরোধে রক্ষণশীলরা তত্বগত দিক থেকে সঠিক ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। ওহি থেকে সৃষ্ট মুসলিম আইনের ভিত্তি প্রয়োগের উপযোগী, পরিণামদর্শী এবং সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিল, সহস্রাধিক বছর পরে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু সংশোধন, প্রতিযোজন এবং পরিবর্ধন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আধুনিক মন যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইসলামের প্রকৃতির খৃষ্টীয় পরিবর্তন বা জীবনে তার প্রযুক্ততা অস্বীকার করার ব্যাপারে সতর্কতা প্রকাশ করে তখন তারা সঠিক পথে চলে।

অতএব আমাদেরকে (খৃষ্টান মিশনারী) সহানুভূতির সঙ্গে ইসলামকে সত্যিকার গণতন্ত্র, সঠিক সমাজতন্ত্র, নির্দোষ পুঁজিবাদ এবং স্থায়ী শান্তির সমপর্যায়ে দেখতে প্রস্তুত থাকতে হবে। লর্ড ক্রমারের বিখ্যাত এবং বেকুবী ধারণা 'সংস্কার হলে ইসলাম থাকে না' এই মন্তব্যের ওপর নির্ভর করা ঠিক হবে না। আমরা চাইনা এবং তা ঠিকও নয় যে এক কালে ইসলাম যেভাবে ছিল এখনও সেইভাবে অবিকৃত থাকবে।"

এর অর্থ হচ্ছে আমাদের দেশীয় আধুনিকতাবাদীরা ধর্মনিরপেক্ষতা ও বস্তুবাদের সঙ্গে ইসলামকে জোর করে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে যে প্রচেষ্টা

চালাচ্ছেন তাতে খৃষ্টান মিশন এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা করছেন। বস্তুতঃ তারা ওদেরই দায়িত্ব সম্পাদনের ঠিকাদারী নিয়েছেন।

ইসলাম প্রিয় প্রতিটি পণ্ডিতের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের নিরঙ্কুশ আবহমানতা, সার্বজনীনতা, চূড়ান্ত আত্মনির্ভর ও মানব রচিত আদর্শ থেকে তাকে স্বাধীন রাখার জন্যে সর্বসম্মত প্রচেষ্টা চালানো। কোরআন এবং সুন্নাহর বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের যথার্থ হেয় করার যে কোন প্রচেষ্টা প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী হিসেবে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা উচিৎ। উম্মাতের মতবিরোধ পরিহার করার জন্যে বিরুদ্ধ মতবাদকে ব্যক্তিগত বা দলের পর্যায়ে বিবেচনা করা উচিৎ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজেকে উম্মাতের অংশ জ্ঞান করেন এবং আল্লাহর একত্ব ও রাসূলের (সা) শেষ নবুয়তকে প্রকাশ্যে অস্বীকার না করেন তাকে আমরা উম্মাতের বহির্ভূত করতে পারি না। কোন ব্যক্তির চূড়ান্ত বিচারের ভার আল্লাহর হাতে। অবশ্য একটি আধুনিক ইসলাম বিরুদ্ধ আন্দোলনকে শীগগীর নিন্দে করা হলে সত্যিকার ইসলাম সম্পর্কে আমাদের বংশধরদের মধ্যে কোন সন্দেহ দানা বেঁধে উঠতে পারবে না। এই ধরনের সিদ্ধান্তে বিলম্ব ইসলামের কোন নির্ধারিত শিক্ষা নেই এবং তা মুসলমান নামধারী শাসকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল– এই ধারণাকেই জোরদার করবে।

আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের সবচাইতে অশুভ প্রচেষ্টা হচ্ছে আধুনিক চিন্তার আলোকে ইসলামের পুনঃব্যাখ্যা। তাদের মনোমোহিনী সঙ্গীত হচ্ছে 'সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে ইসলামকেও পরিবর্তন করতে হবে।' 'প্রগতি'তে এরা এতই আচ্ছন্ন যে, যে কোন মামুলি পরিবর্তনকেই তারা বিরাটগুণ মনে করেন। তারা কখনো ভাবেন না যে এই পরিবর্তন আমাদের কল্যাণ কি অকল্যাণ আনছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে ইসলামের পরিবর্তন করতে হবে তাতে যে ক্ষতিই হোক না কেন। তাদের দৃষ্টিতে একমাত্র গুণ হচ্ছে বাতাসের অনুকূলে ভেসে যাওয়া। কোন দিকে যাচ্ছে সেটা বড় কথা নয়।

পশ্চিমারা যদি গান, নাচ, ছবি এবং মূর্তি ভালবাসে তাই সত্যিকার (?) ইসলামী এবং মুসলমানদেরকেও তা করতে হবে। পুঁজির সুদ যদি আধুনিক অর্থনীতির ভিত্তি হয় অনগ্রসরতা ও অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠে প্রগতিশীল ও আধুনিক হওয়ার জন্যে মুসলিম দেশেও তা চালু করতে হবে। সর্বাধুনিক

ফ্যাশান যদি আধুনিক জীবনের প্রবণতা হয় তাহলে তাকে ইসলামী পোষাক ঘোষণা করে আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। খৃষ্টান মিশনারীরা যদি পর্দাকে তথাকথিত নারী অবনতি ও হীনমন্যতার প্রতীক আখ্যায়িত করে নিন্দে করে, ইউরোপ ও আমেরিকার মত নারী মুক্তির সহায়তা করার জন্যে আমাদেরকে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

আধুনিকতাবাদীরা যদি বহুবিবাহ এবং তালাকের সাহায্যে বিবাহ বিচ্ছেদকে অসহনীয় অন্যায় বলে, তাহলে আলোকপ্রাপ্ত এবং প্রগতিশীল হওয়ার জন্যে মুসলিম বিশ্বকেও সেই ভাবে মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিবর্তন করতে হবে। ডঃ কেনেথ ক্র্যাগ লিখেছেন: "সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, সমান আচরণের শর্তে চার স্ত্রী গ্রহণের কোরআনিক অনুমতি প্রকৃতপক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা। বাইবেলের সমালোচনায় যে ব্যাখ্যাই দেয়া হোক না কেন, ফলাফল খুবই কাঙ্খিত।

ডঃ কেনেথ ক্র্যাগ এবং আগ্রহীদের জন্যে এটি কাঙ্খিত। এই ধরনের ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তিতে কতখানি বুদ্ধিবৃত্তিক অসাধুতা এবং কপটতা আছে তাতে কিছু এসে যায় না। লক্ষ্যই কার্য পদ্ধতির যথার্থ নির্ণায়ক।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান : মুসলিম বিশ্বের আধুনিকতার অগ্রদূত

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ১৮১৭ সালের ১৭ই অক্টোবর দিল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ধর্মীয় পরিবেশে গড়ে উঠেন। তিনি প্রাচীন ও চিরাচরিত ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করেন। তবে আরবী এবং ফার্সীর ব্যাপারে এতই অসহিষ্ণু ছিলেন যে, যখনই পেরেছেন তা পরিহার করেছেন। যৌবনকালে তিনি অবাধ জীবন যাপন করেছেন এবং নাচ গানের উৎসবে খুবই ঘনঘন যাতায়াত করতেন। ১৮৩৮ সালে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকুরী নেন। যথা নিয়মে বিভিন্ন শহরে তিনি সাবজজ নিযুক্ত হন।

উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি যৌবনের বেখেয়ালী অবস্থায় অর্জিত সামান্য ইসলামী জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং তার সময়ের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের কাছে অধ্যয়ন শুরু করেন। অবসর সময়ে নবীর জীবনীসহ কয়েকটি ধর্মীয় পুস্তিকা রচনা করেন। এগুলোতে ধর্মীয় গোঁড়ামী থাকলেও বিষয়বস্তু এবং সাহিত্যিক মানে ছিল খুবই সাধারণ।

১৮৪৭ সালে 'দিল্লীর বিখ্যাত জনগণ ও স্মৃতিস্তম্ভে'র ইতিহাস Athar al sanadid প্রকাশ করে স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন। এ ঐতিহাসিক কাজে পাণ্ডিত্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় লেখায় তার পাণ্ডিত্যের দৈন্য খুবই সুস্পষ্ট হয়েছিল। এটি ১৮৫৪ সালে পুনঃমুদ্রিত হয় এবং বহুবছর পরে ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। ১৮৬৩ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ খান লণ্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির অবৈতনিক সদস্যপদ লাভ করেন। এই বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে উর্দু কবি গালিব মন্তব্য করেছেন যে, সৈয়দ আহমদ খানের উচিৎ ভারতে ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে ইংরেজী সংস্কৃতি অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করা। আমরা এখন দেখতে পাব কত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি এই উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ এবং পরবর্তীকালে ভারতে বৃটিশ রাজত্ব থেকে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে, ভারতের মুসলমানদের মুক্তির পথ হচ্ছে বৃটিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা এবং তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করা। তিনি নিজেকে স্বঘোষিত মধ্যস্থতাকারী করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বললেন, ধর্মীয় কারণে মুসলমান এবং খৃষ্টানদের শত্রুতা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। কারণ বিশ্বের সকল ধর্মের চাইতে খৃষ্টান ধর্ম এবং তার প্রবর্তকের প্রতি মুসলমানদের সর্বাধিক শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি ইংরেজদেরকে আশ্বাস দিলেন যে, ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, "আল্লাহর ইচ্ছায় যদি আমরা কোন জাতির অধীনস্থ হই এবং তারা যদি ভারতে বৃটিশদের ন্যায় আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়, ন্যায়ের সঙ্গে শাসন করে, দেশে শান্তি বজায় রাখে এবং আমাদের ব্যক্তিসত্ত্বা ও সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়, আমরা তাদের আনুগত্য করতে বাধ্য।"

ইসলামকে রাজনৈতিক গোলামীতে রাখার ব্যাপারে আপোষ করতে গিয়ে তিনি ঈসা (আ)-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন, মিশরের ফেরাউন অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার আনুগত্য করেছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষার উৎসাহে তিনি বৃটিশ সরকারের অধীনস্ত মুসলিম কর্মচারীদের জন্যে সরকারী বিশেষ নির্দেশ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন। "আমি এতে সমদর্শী ও নিরপেক্ষ বৃটিশ সরকারের পুরস্কার ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করব, যাতে ভারতের সকল মুসলমান এটা পড়ে আমাদের দয়ালু সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করতে পারে।"[১]

মুসলমানদের ইংরেজী সংস্কৃতি প্রীতি বাড়ানোর জন্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সামাজিক ব্যবধান দূর করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। এই সময় তিনি খৃষ্টানদের সঙ্গে একই টেবিলে মুসলমানদের খাওয়া আইনসঙ্গত ঘোষণা করে তার বিখ্যাত ফতোয়া জারী করেন। এই ধারণার প্রতি মুসলমানদের আকৃষ্ট করার জন্যে তিনি কোরআনের ঐ সব আয়াত উদ্ধৃত করেন যেখানে বলা হয়েছে আহলে কিতাবদের খাদ্য মুসলমানদের জন্যে জায়েয। কিন্তু ধর্মীয় আচার অনুসারে হারাম গোস্তের প্রশ্ন দেখা দিলে তিনি

১. Reforms and religious ideas of Sir Sayyid Ahmed Khan J. M. S. Beljon, Md. Ashraf. Lahore. P-2.

দারুণ অসুবিধায় পড়েন। তিনি সন্দিগ্ধ হাদীসের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, জবাই না করা জন্তুর গোস্তও মুসলমানেরা খেতে পারে।

১৮৬৯ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ ইংল্যান্ড সফরের সিদ্ধান্ত নেন। তার উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ শক্তির উৎসের সন্ধান লাভ করে তার দেশবাসীকে একই পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা। তিনি ভারতের মুসলমানদের চাইতে ইংরেজদের শুধু শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে নয় বরং সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রাধান্য লক্ষ্য করে অভিভূত হয়ে পড়েন। ১৮৬৯ সালের ১৫ই অক্টোবর লণ্ডন থেকে বাড়ীতে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেন, ইংরেজদের চাটুকারীতা না করেও আমি বলতে পারি ভারতের বাসিন্দা উচ্চ কিংবা নীচ, ব্যবসায়ী কিংবা ছোট দোকানদার, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ইংরেজদের সঙ্গে শিক্ষা আচার ব্যবহার এবং সততার দিক থেকে তুলনায় সক্ষম সুন্দর মানুষের কাছে ক্লেদাক্ত জন্তুর মত। ভারতের অধিবাসীদের পুরুষত্বহীন নির্বোধ ভাবার ইংরেজদের যুক্তি আছে। আমি যা দেখেছি এবং প্রতিদিন যা দেখি কোন কোন ভারতীয়ের পক্ষে তা কল্পনা করাও অসম্ভব। 'মোহাম্মদী' সম্প্রদায়ের চতুর্দিকে আত্মপ্রসন্না স্বজাত্যের মারাত্মক আবরণ রয়েছে। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের পুরনো কাহিনী স্মরণ করে এবং ভাবে যে, তাদের মত কেউই নেই। মিশর এবং তুরস্কের 'মোহাম্মদী'রা দিন দিন সভ্য হচ্ছে। এখানকার মত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা না গেলে ভারতীয়দের পক্ষে সভ্য এবং সম্মানিত হওয়া অসম্ভব।

স্যার সৈয়দ আহমদ প্রমাণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন যে, আধুনিকতার পরিপন্থি প্রাচীন আচার-আচরণ পরিহার করা হলে মানবতা, সভ্যতা ও অগ্রগতির বাহনরূপী সত্যিকার ধর্মে ইসলামকে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

মুসলমানদের মধ্যকার আধুনিকতাবাদীদের উন্নতির জন্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ১৮৭৮ সালে আলিগড়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, আরবী ফার্সী, উর্দু অথবা যে কোন ভারতীয় ভাষার সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে অসন্দিগ্ধ হয়ে তিনি ইংরেজীকেই শিক্ষার একক মাধ্যম করার ওপর জোর দেন। ১৯২০ সালে আলিগড় স্কুল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত হয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান আধুনিক আত্মপক্ষ সমর্থনকারীদের অগ্রদূত। আত্মপক্ষ সমর্থনকারী কিছু বক্তব্য নিম্নরূপ :

১। বহু বিবাহ ইসলামের প্রকৃতি বিরুদ্ধ, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এর অনুমতি দেয়া উচিৎ নয়।

২। ইসলাম দাসপ্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে এমনকি শরিয়তের অনুমোদন প্রাপ্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসত্ব করানো যাবে না।

৩। আধুনিক ব্যাংকিং, বাণিজ্যিক লেন দেন, কর্জ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতিতে যে সুদের ব্যবস্থা আছে তা ঠিক রিবার (সুদের) ব্যাখ্যার আওতায় পড়ে না, অতএব তা কোরআনী আইনের বিরুদ্ধ নয়।

৪। কোরআন এবং সুন্নাহ চুরির জন্যে হাতকাটা, ভেজাল দেয়ার জন্যে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা এবং অবিবাহিত যুবক-যুবতীর যৌন সংসর্গের জন্যে যে একশ বেত্রাঘাতের শাস্তি বিধান করেছে তা বর্বরতার পরিচায়ক এবং প্রাথমিক যুগে যখন জেল ছিল না কেবলমাত্র তখনকার জন্যে তা প্রযোজ্য ছিল।

৫। আত্মরক্ষার অন্তিম প্রয়োজন ছাড়া জেহাদ নিষিদ্ধ।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ইসলামের একমাত্র সত্য জিনিস বিবেচনা করেছেন উনিশ সতকের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদের সঙ্গে ইসলামের সামঞ্জস্য বিধান। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, ধর্ম যদি মানব প্রকৃতি বা সাধারণ প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবেই তা সত্য হতে পারে। ইসলামকে বিজ্ঞান এবং যুক্তিভিত্তিক ধর্ম প্রমাণ করার জন্যে তিনি ভাগ্য, ফেরেশতা, জ্বিন, কুমারীর গর্ভে হযরত ঈসার (আ) জন্মকে অস্বীকার করেছেন, নবীর (সা) মিরাজে গমনকে একটা সাধারণ স্বপ্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং শেষ বিচারের দিনে স্বশরীরে উপস্থিতি, বেহেশত দোজখ প্রভৃতিকেও অস্বীকার করে বলেছেন এগুলো শাব্দিক অর্থে গ্রহণ না করে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা উচিৎ। তিনি ওহি নাজিলের মত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়কেও মানসিক অসুস্থতাজনিত মতিভ্রমের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সের ওহি বিহীন ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে খোদাকে বিশ্বাস করেছেন। তার মতে খোদা নির্জন এবং সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ। প্রকৃতির বিধান অপরিবর্তনীয়। এমনকি খোদাও তা পরিবর্তন করতে পারেন না। সুতরাং তার কাছে প্রার্থনার কোন মানে নেই।

এ ধরনের নিষ্প্রাণ ও নৈর্ব্যক্তিক দেবতার প্রতি আমাদের কোন আগ্রহই থাকতে পারে না।

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মতে কোরআন এবং সুন্নাহর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় বিষয়ে সীমাবদ্ধ। কোরআন এবং হাদীসের যেসব আয়াতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কথা-বার্তা বলা হয়েছে সেগুলো নবীর যুগের প্রাথমিক অবস্থার জন্যে প্রযোজ্য ছিল। আমাদের মত আলোকপ্রাপ্ত আধুনিক সভ্যতার জন্যে তা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। অতএব মুসলমানরা যদি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি হিসেবে অনুসরণ না করে তাহলে পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহণে কোন বাধা নেই।

এটা সুস্পষ্ট যে, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনে কোন আগ্রহ ছিল না। তার সম্পর্কে এতটুকু বলা যায় যে, তিনি ভারতের মুসলমানদের সামাজিক এবং আর্থিক কল্যাণ চেয়েছিলেন। তার ধারণা ছিল পার্থিব অগ্রগতির মাধ্যমেই তারা উন্নতি করতে পারবে। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যে, ইতিহাসে কোন জাতিই এমনকি বস্তুগত দিক থেকেও বিদেশী শাসনাধীনে উন্নতি লাভ করতে পারেনি। মীর্জা গোলাম আহমদ (১৮৩৯-১৯০৮) বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার মনিবের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, বৃটিশ শাসনের জন্যে এক ফোটা রক্তদানকে খুবই অপরিহার্য ঘোষণা করে। অপরদিকে জেহাদকে একটি অপরাধ হিসেবে নিন্দা করে তিনি বস্তুত স্যার সৈয়দ আহমদের ধারণাই সমর্থন করেছেন।

ভারতে নির্বাসনকালে জামালুদ্দিন আফগানী (১৮৩৮-৯৭) স্যার সৈয়দ আহমদের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি তার Al-Urwah Al-Wuthqa গ্রন্থে লিখেছেন, "ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মুসলমানদেরকে চরিত্রহীন করার জন্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে উপযুক্ত পাত্র হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন, এ জন্যে তারা তাকে প্রশংসা ও সম্মান করতে শুরু করলেন এবং আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করলেন এবং এটাকে মুসলমানদের কলেজ আখ্যায়িত করলেন, যাতে ঈমানদারদের সন্তানদের আকৃষ্ট করে তাদের

মধ্যে নাস্তিকতা প্রচার করা যায়। বস্তুবাদী স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খান ইউরোপের বস্তুবাদীদের চাইতেও জঘন্য, কারণ পশ্চিমা দেশে যারা ধর্ম ত্যাগ করে তারা দেশপ্রেম ত্যাগ করে না এবং পিতৃভূমিকে সমর্থন করার উৎসাহ হারায় না। অপরদিকে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খান এবং তার বন্ধুরা বিদেশী স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন।"[২]

স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খানের পরবর্তী পশ্চিমানুসারীদের ওপর তার প্রভাব অস্বাভাবিক নয়। তার আত্মপক্ষ সমর্থনকারী বক্তব্য আজও বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসৃত হয়। আমীর আলী, চিরাগ আলী, খুদা বক্‌শ, গোলাম আহ্‌মদ পারভেজ, খলিফা আবদুল হাকিম এবং কাদিয়ানী আন্দোলনের মাওলানা মোহাম্মদ আলী লাহোরী তার বক্তব্যই পুনরাবৃত্তি করেছেন। এখন পর্যন্ত তাদের নতুন কোন বক্তব্যই নেই।

২. The reforms and religious Ideas of Sir Sayyid Ahmed Khan, op. cit. pp 117-119.

অবিশ্বাসের প্রবণতা
আমীর আলীর স্পিরিট অফ ইসলামের পর্যালোচনা

সৈয়দ আমীর আলীর Spirit of Islam একই বিষয়ে ইংরেজী ভাষীদের কাছে খুবই পরিচিত। বস্তুত তা ইংরেজী ভাষার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। একইভাবে ইউরোপ এবং আমেরিকার ধর্মান্তরিত মুসলমানরা এই বই থেকে ইসলামের একটা বিকৃত ধারণা লাভ করেন। একজন ইংরেজ মুসলমান এই বই সম্পর্কে বৈচিত্র্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন : "ইসলাম সম্পর্কিত অধ্যয়নে যে বইটি আমাকে সব চাইতে প্রভাবিত করেছে সেটি হচ্ছে সৈয়দ আমীল আলীর Spirit of Islam, যদিও বইটি মুসলিম বিশ্বে সমালোচনার উর্ধে নয়। এতে বহু আচার প্রথার সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। এতে অবশ্য মুসলমানদের সামনে ঈমানের অনুপ্রেরণামূলক বিশালতা তুলে ধরা হয়েছে যা জীবনে বাস্তবায়ন করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। এটি নিঃসন্দেহে এমন বই যা প্রতিটি মুসলমান ছাত্রের পড়ার চেষ্টা করা উচিৎ"।

মুসলিম বিশ্বে এর আশাতীত সমালোচনা হয়েছে। বস্তুতঃ শুধুমাত্র সমালোচনাই যথেষ্ট নয়। উলেমারা যদি ঘুমিয়ে না থেকে দায়িত্ব সচেতন হতেন তা হলে এই বই এর বিষয়বস্তু ধর্মের বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করা উচিৎ ছিল।

১৮৪৯ সালে শিয়া ধর্মানুসারী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আমীর আলী আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং স্যার সৈয়দ আহমদের একনিষ্ঠ শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন্। খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি ইংরেজী সংস্কৃতির প্রতি সীমাহীন উৎসাহী ছিলেন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি স্বীকার করেছেন যে, ১২ বছর বয়সের ..... মুগ্ধ হয়ে ছিলেন এবং বিশ বছর বয়সে তিনি শেক্সপিয়ার, মিলটন, কীট্স, বায়রন, রংফেলো সহ অন্যান্য কবির অধিকাংশ বই এবং Thackery ও স্কট প্রমুখের উপন্যাস শেষ করেছেন। শেলীকে অন্তর দিয়ে জানতেন। পরে তিনি ওকালতি শুরু

করেন এবং যৌবনের অধিকাংশ সময় ও ১৯২৮ সালের মৃত্যু পর্যন্ত তার ইংরেজ স্ত্রীর সঙ্গে লন্ডনে কাটান।

তার বিখ্যাত Spirit of Islam এর প্রথম সংস্করণ ১৮৯১ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালে বর্তমান রূপ গ্রহণ করার আগে আমীর আলী বইটি বহুবার সংশোধন এবং পরিবর্ধন করেছেন। তখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যাণ্ডে বইটি বার বার ছাপা হচ্ছে। এই বই এর অংশ বিশেষ আরবী এবং তুর্কী ভাষায় অনুদিত হয় এবং সে সব এলাকার আধুনিক শিক্ষিতদের প্রশংসা লাভ করে। Spirit of Islam গ্রন্থের লক্ষ্য ছিল ইসলামকে উদার এবং যৌক্তিক ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করা। এই কারণে বহু বিবাহ, পর্দা এবং জেহাদকে ইসলামের সত্যিকার মেজাজের বিরোধী বলে নিন্দে করা হয়েছে। এইভাবে তিনি আশা করেছিলেন যে, ইউরোপীয় নব মুসলমানরা পশ্চিমা আদর্শের সঙ্গে ইসলামকে সমপর্যায়ে দেখবেন।

Spirit of Islam এর প্রথম অর্ধাংশ জুড়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন তুলে ধরা হয়েছে। এখানে তিনি পশ্চিমী জগতকে দেখাতে চেয়েছেন তাঁর চরিত্র ছিল মিষ্ট, কোমলতা, ভদ্রতা, ক্ষমা, দয়া এবং ভালবাসার সমষ্টি। এই ধরনের আত্মপক্ষ সমর্থনকারী সকল সাহিত্যিক হীনমন্যতাবোধ থেকে মহানবীর জেহাদকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

"শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার আগেই কোরাইশ সৈন্য মাঠে এসে গেছে। জীবনে কোনদিন অস্ত্র হাতে ধরেননি। মানুষের দুঃখ কষ্টে যিনি বেদনাভারাক্রান্ত হতেন, যিনি ছিলেন আরব চরিত্রের বিপরীত, আপন সন্তান বা শিষ্যের মৃত্যুতে কেঁদে বুক ভাসাতেন, যার হৃদয় এতই কোমল এবং করুণ হওয়ার কারণে শত্রুরাও তাকে নারীসুলভ কোমল হৃদয়ের অধিকারী বলতেন, তাঁকেই পরিস্থিতির প্রয়োজনে ইচ্ছার বিরুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ শক্তির দ্বারা প্রতিহত করতে হল এবং আত্মরক্ষার জন্যে সাহাবীদের সংঘবদ্ধ করতে হলো।" (পৃঃ ২১৪-২১৮)

বই এর লেখক পশ্চিমা সমালোচনার মুখে নিজেকে এতই দুর্বল মনে করতেন যে, জেহাদের ধারণাকে তিনি কুলক্ষণে মনে করতেন এবং এই কারণে দেখাতে চেয়েছেন যে, আমাদের মহানবী প্রকৃতপক্ষে শত্রুর সঙ্গে

লড়াই করতে চাননি। কেবল মাত্র পরিস্থিতি তাকে তা করতে বাধ্য করেছে। রাসূলুল্লাহর নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থ -যেমন, ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের 'সিরাতে রাসূলুল্লাহ' আল ওয়াকিদীর 'কিতাব আল মাঘাজী'তে এ ধরনের আচরণের সাক্ষ্য দেয় না। কোরআনের অষ্টম এবং নবম সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য হচ্ছে জেহাদ। এ থেকেই আমীর আলীর আত্মপক্ষ সমর্থনকারী বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়। আধুনিক মন মানসিকতা নিয়ে তিনি বর্তমানকে অতীতে দেখতে চেয়েছেন। "এই খ্যাতনামা শিক্ষকের মন বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রগতির দিক থেকে ছিল আধুনিক, তার কাছে মানবতার সেবাই ছিল সর্বোচ্চ এবাদত" (পৃঃ-১২১)।

লেখক পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কোরআন অভ্রান্ত নয় এবং সম্পূর্ণ মানবিক ধ্যানের ফলাফল।

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ধর্মীয় সচেতনতায় মহান শিক্ষকের মন পূর্ণত্ব লাভ করার আগে মধ্যবর্তী পর্যায়ের সূরাগুলোতে জোরোয়াষ্টার, সাবিয়ান এবং ইহুদী পুরানের ভাসা ভাসা বিবরণ থেকে স্বর্গ ও নরকের বাস্তব ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মরুভূমির সাধারণ মানুষের জন্যে ভাষার এই চাতুর্যের প্রয়োজনও ছিল। যাতে তারা এসব দেখে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিনয় ও ভালবাসার দ্বারা প্রার্থনা করে এবং খোদার সত্যিকার অস্তিত্ব অনুধাবন করতে পারে। জোরাষ্টারদের কাছ থেকেই স্বর্গ এবং হুরের ধারণা এসেছে অপরদিকে ইহুদী পুরানে কঠোর শাস্তির জন্যে নরকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্ভবতঃ ধর্মীয় চেতনার প্রথম দিকে মুহাম্মদ নিজে তার চারিদিকের চিরাচরিত জিনিসে বিশ্বাস করতেন, তবে আত্মার ব্যাপক জাগৃতির ফলে বিশ্বের স্রষ্টার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ সৃষ্টি হয় এবং যে সব চিন্তা বস্তুগত দিক থেকে অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল তা প্রথমে আধ্যাত্মিকতায় রূপ নেয়। মহান শিক্ষকের মন শুধুমাত্র সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে পরিবর্তিত হয়নি বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের ব্যাপারে তার সাহাবীদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেও পরিবর্তিত হয়েছে, উন্নত মনের দ্বারাই গুণাগুণ অনুধাবন করা যায়। সাধারণ বুদ্ধির লোক, অশিক্ষিত লোকদের ব্যাপক বা সংক্ষিপ্ত যে ধরনেরই হোক না কেন বিধি-নিষেধের প্রয়োজন রয়েছে।" (পৃঃ ১৯৭-১৯৮)।

আমীর আলী পরকালের সত্যিকার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারেননি। তবে সাধারণ মানুষের উন্নতির অপরিহার্য হাতিয়ার হিসাবে তা স্বীকার করে নিয়েছেন। এই জন্যে জীবন সম্পর্কে প্রাচীন জোরাষ্ট্রানদের ধারণার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে দেখিয়েছেন এগুলো কিভাবে মুহাম্মদের বিশ্বাসে প্রভাব ফেলেছে। শিয়াদের ধর্মমতানুসারে খলিফাদের ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে অন্যায়ভাবে তিনি তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর সমালোচনা করেছেন।

"হযরত আবু বকরের তীক্ষ্মতা, হযরত ওমরের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণোৎসাহ এবং নৈতিক সুক্ষ্মতা হযরত ওসমানের ছিল না। Dozy সুস্পষ্টভাবে প্রতারিত ধর্ম যাজকের (?) চরিত্র অঙ্কন করেছেন। ওসমানের ব্যক্তিত্ব খলিফা হিসেবে তার নির্বাচনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে না। এটা সত্য যে, তিনি ধনী এবং দরদী ছিলেন, মুহাম্মদ (সা) এবং ইসলামকে আর্থিক সাহায্য করেছেন এবং প্রায়ই প্রার্থনা করতেন, রোজা রাখতেন এবং তিনি অমায়িক ও দয়ার্দ হৃদয় ছিলেন। তিনি অবশ্য প্রেরণাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন এবং বার্ধক্যজনিত দুর্বল ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই বৃদ্ধ মানুষ তার আত্মীয়দের প্রতি অসাধারণ দুর্বল ছিলেন। তারা মক্কার ঐসব অভিজাত যারা ২০ বছর ধরে মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাঁকে শাস্তি দিয়েছে, অপমান করেছে, খলিফা এসব লোকদের আনুকূল্য করেছেন। সমগ্র সাম্রাজ্য থেকে মদীনায় অভিযোগ আসতে শুরু করে। কিন্তু প্রায় অভিযোগই গালি আর কর্কশ ভাষায় বাতিল করা হয়েছে। খলিফা আবু বকরের ছেলে মোহাম্মদের নেতৃত্বে ১২ হাজার লোকের একটি প্রতিনিধিদল ওসমানের কাছে অভাব অভিযোগ জানাতে এবং তার প্রতিকার দাবী করতে এসেছে। ফেরার পথে খলিফার সীলমোহর সহ তার সেক্রেটারী একটি চিঠি দিয়েছেন। যাতে নীতিজ্ঞানশূন্য মুয়াবিয়াকে বলা হয়েছে তাদেরকে সদলবলে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। তার 'বিশ্বাসঘাতকতায়' বিক্ষুব্ধ হয়ে তারা মদীনায় ফিরে যায় এবং বৃদ্ধ খলিফার ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা করে। ওসমানের মৃত্যুর পর উমায়াদের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত ইসলাম বিরোধী, ইসলামের গণতন্ত্র সাম্য এবং নেতিকতার কঠোর নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সুযোগ সৃষ্টি হয়।" (পৃঃ ২৯৪-২৯৫)।

আমাদের প্রিয় নবীর বিশ্বস্ততম সাহাবীর বিরুদ্ধে ইতিহাসের এই নিন্দাকারী ভাষা। ওসমান বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। উল্লেখিত চিঠিগুলি ছিল জাল যাতে ওসমানের কিছুই করণীয় ছিল না। লেখক যেভাবে চিত্রিত করেছেন, খোদা না করুক ওসমান যদি সত্যিই সেরূপ হতেন তাহলে আমাদের মহানবী কখনো তাকে তার বিশ্বস্ত সহচরদের অন্তর্ভুক্ত এবং সরাসরি বেহেশতে গমনকারী দশজনের একজন বলে ঘোষণা করতেন না। আমাদের মহানবী ঘোষণা করেছেন ওসমান বেহেশতে তার নিত্য সহচর থাকবেন। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসেই ওসমানের গুণাবলীর স্বীকৃতি রয়েছে। ওসমানের সঙ্গে বিশ বছরেরও অধিক সময় কাছাকাছি থেকে আমাদের প্রিয় নবী ওসমানের চরিত্র সম্পর্কে আধুনিকতাবাদী এবং শিয়া প্রভাবিতদের চাইতে অনেক বেশী প্রাজ্ঞ ছিলেন।

একই ভাবে এই লেখক মুসলিম বিশ্বের পরবর্তী অধঃপতনের জন্যে ইমাম এবং মুজাদ্দিদদের দোষারোপ করেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে তিনি কিভাবে চিহ্নিত করেছেন তার নমুনা -চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ 'সুন্নী গীর্জা সম্প্রদায়ের' সৃষ্টি হয় ইবনে হাম্বলের হাতে। তিনি মামুন এবং তার উত্তরাধিকারী মুতাসীম বিল্লাহর সময় উন্নতি লাভ করেন। এই দুইজন খলিফা ছিলেন 'মতাজিলা পন্থী' ইবনে হাম্বলের চরম গোঁড়ামী এবং জেদ, যার দ্বারা তিনি ধর্মান্ধতা দিয়ে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করতে চেয়েছিলেন, তা শাসকদের সঙ্গে তার মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। ইবনে হাম্বল এবং তার হিতৈষীরা মুতাজিলা প্রচারে মানুষের অসৎ সাফল্যের জন্যে এবং ঘন ঘন মুসলিম হত্যা অভিযানের জন্যে দায়ী। এই হত্যাভিযান মুসলিম ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করেছে।" (পৃঃ ৩৫২)

"অতি শুদ্ধাচারী ব্যক্তি ইবনে হাম্বল তার মতবিরোধীদের চির অবলুপ্তি কামনা করতেন। তিনি হানাফীবাদের উদারতায় মনক্ষুন্ন, মালেকীবাদের নিরঙ্কুশ সংকীর্ণতায় হতাশ এবং শাফেয়ীবাদের সাধারণ চরিত্রে সুখী হতে না পেরে চিরাচরিত প্রথার ভিত্তিতে সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্যে একটি নতুন পদ্ধতি চালু করেন। আবু হানিফা চিরাচরিত প্রথার অধিকাংশ প্রত্যাখ্যান করেছেন, (ইহা ঠিক নয়)। ইবনে হাম্বলের পদ্ধতি অসঙ্গত, অযৌক্তিক

এবং হতবুদ্ধিকারী গল্পের সমষ্টি যার অধিকাংশই পরস্পরের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং মনগড়া। তিনি বিদ্যা অর্জন ও বিজ্ঞানের নিন্দে করেছেন এবং যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

জনসাধারণের মধ্যে তার বাগ্মীতা অথবা প্রচন্ডতা ধর্ম প্রচারের মঞ্চ থেকে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে আগুন ছড়াতে শুরু করলো। বাগদাদের রাস্তায় ঘন ঘন দাঙ্গা এবং রক্তপাত শুরু হল। গোলযোগের প্রধান উদগাতাকে জেলে পাঠানো হয় এবং সেখানেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন (খৃঃ ৪৩৮-৪৩৯)। ইবনে হাম্বলের প্রধান অনুসারী ধর্মতত্ত্বের ছাত্ররা দুর্বল আব্বাসীয় খলিফাদের জন্যে বাগদাদে বিরাট সমস্যার কারণ হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের নিয়ে দায়িত্বহীন ছিদ্রান্বেষী সমালোচকদল গড়ে তুলল। তারা জোর করে মানুষের বাড়ীতে ঢুকে বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে দিত এবং এ ধরনের বর্বরতা চালাতো (পৃঃ ৪৮৭)।

এইভাবে লেখক শরিয়তের বিধানকে সেকেলে এবং প্রগতির বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেন। মুসলমানদের বর্তমান জড়ত্বের কারণ হচ্ছে মুসলমানদের সাধারণ বিশ্বাস। এই বিশ্বাস চিন্তার স্বাধীনতা ও বিচার বিচক্ষণ ক্ষমতা হরণ করে কিছু জিনিস মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দিয়েছে। নবী যুক্তিকেই মানব মনীষার সর্বোচ্চ এবং আদর্শ অবদান বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমাদের মধ্যযুগের পণ্ডিত এবং তাদের অনুসারীরা এর প্রয়োগকে সবচাইতে পাপ এবং অপরাধ বলে গণ্য করেছেন। আজকের মুসলমানেরা সেই মেজাজ হারিয়ে ফেলেছেন। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা প্রকাশ করতে গিয়ে তার প্রাথমিক যুগের অনুসারীরা তখনকার জন্যে প্রযোজ্য আদেশ এবং নিয়মকানুনকে সর্বকালের করে দিয়েছেন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারকের প্রচলিত এবং একটি আধা সভ্য জাতির জন্যে প্রযোজ্য বিধানকে এখন পর্যন্ত চালু করা নবীর প্রতিই অবিচারের সামিল। সমাজ ও নৈতিকতার ক্রম পরিবর্তনশীল ধারণা নিয়ে কারও পক্ষেই চিরকালের বিধান দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মানবতার প্রগতিশীল দাবীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন ধর্মই এত বিরাট প্রতিশ্রুতি দেয়নি (পৃঃ ১৮২-৮৩)। গীর্জার জনক যা দিয়েছেন তা অপরিবর্তনীয় এবং আলোচনার আওতা বহির্ভূত। (পৃঃ ৩৫৩)।

আমীর আলীর মতে মুতাজিলাদের পথই ইসলামের সত্যিকার পথ। তার অনুসারী আলকিন্দী, আল ফারাবী, ইবনে সিনা এবং রুশদ ইসলামের ভেতর গ্রীক দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটাতে চেষ্টিত হয়েছিলেন। আমীর আলী মুতাজিলাদেরকে অগ্রপথিক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। জীবনের মূল সূত্রে না হলেও আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার দিক থেকে। যে সব মুজাদ্দিদ বাইরের ধ্যান ধারণাকে বাতিল করে সত্যিকার ইসলাম রক্ষা করেছিলেন তিনি তাদেরকে মুসলিম বিশ্বের ক্ষতির জন্যে দায়ী করেন। এটা সুস্পষ্ট যে, লেখক যার পক্ষে ওকালতি করেছেন তা ইসলাম ছিল না বরং তা ছিল মুসলিম নামের ছদ্মাবরণে পশ্চিমা ধ্যান ধারণা।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ
মুসলিম ভারতে জাতীয়তা ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা

মুসলমানদের মৌলিক গলদ হচ্ছে ইসলামকে পরিসমাপ্ত পদ্ধতি হিসেবে ব্যাখ্যা করা। বাইরের সত্য থেকে শুধু নয় বাইরের জনগণের জন্যেও তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ভারতের মুসলমানদের এবং ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক আশার কথা হচ্ছে এ সম্প্রদায় তা ভাঙ্গতে পারে..... তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ মানবীয় আচরণের জন্যে চেষ্টা করতে পারে। (পৃঃ ২৯০)। অতীতে রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সামাজিক সংস্থা ইসলামের এতই মুখ্য বিষয় ছিল সবকিছু হাঁ অথবা না দিয়ে বিবেচনা করা হতো। মুসলমানদের হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল অথবা ছিল না। এর আগে কখনও তারা অন্যের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করেনি। ইসলামের দ্বার বন্ধ– এই থেকে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, মুসলমানদের সামাজিক গ্রুপ বা দল একটি আইনানুগ পরিপূর্ণ সংগঠন। এই বিশ্বাসই পরিশেষে ইসলামকে ভারতে অনুপযুক্ত প্রমাণ করেছে। (পৃঃ ২০৬-৭)[১]

একজন খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ ভারতের মুসলমান ও হিন্দুদের সম্পর্কের বিষয়টি এভাবে দেখেছেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এই ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্লেষণকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছেন। তিনিই প্রথম আধুনিক জাতীয়তা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের কথা বলেন।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সম্পূর্ণ ইসলামী পরিবেশে গড়ে উঠেন। তার বাবা মাওলানা মোহাম্মদ খয়েরুদ্দিন একজন জ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন এবং আরবী ফারসী ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভারতের সব এলাকায় তার হাজার হাজার শিষ্য ছিল। ১৮৫৭ সালে বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ দমন করার পর হাজারো মানুষের মত মাওলানার বাবাও জীবনের তাগিদে দিল্লী

---

১. Islam in modern History, wilfred cantwell smith Princetion university press, 195.

ছেড়ে পালিয়ে যান। তার বিশ্বস্ত শিষ্যরা ব্যবস্থা করার পর তিনি আরবে চলে যান এবং মক্কায় আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি নগরীর খুবই ধার্মিক এবং বুজুর্গ ব্যক্তির কন্যার পানি গ্রহণ করেন। মহিলাটি খুবই বুদ্ধিমতি এবং আরবী ভাষার একজন পন্ডিত ছিলেন। এই মহিলার গর্ভেই ১৮৮৮ সালে আবুল কালাম আযাদ জন্মগ্রহণ করেন। তার মা অন্য কোন ভাষা না জানার কারণে আরবীই তার মাতৃভাষা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে তাকে কোন বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়নি। বরং তার মা বাবা এবং তার বাবার বন্ধু আরবী পণ্ডিতদের কাছে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯৮ সালে একজন শিষ্যের জরুরী অনুরোধে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। এখানে গৃহশিক্ষকের কাছে বালক আবুল কালাম আরবী, ফার্সী, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, অঙ্ক, ভূগোল এবং ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। সাধারণভাবে এই বিদ্যা অর্জনে ১৪ বছর সময় লাগে। অসাধারণ মেধাবী আবুল কালাম ৪ বছরেরও কম সময়ে এই বিদ্যা অর্জন করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিপদ অনুভব করে তার বাবা পশ্চিমা সভ্যতা এবং তার সকল বাহনের কঠোর বিরোধিতা শুরু করেন। ইংরেজী শিক্ষা এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খানের দেয়া ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যাকে ধর্মের প্রতি অভিসম্পাত মনে করেন।

আবুল কালাম আযাদ প্রকৃতপক্ষে অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি ইমাম আল গাজ্জালীর জীবনী লেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি শ্রদ্ধেয় আলেম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। অবসর সময়ে তিনি শিল্পগুণ সম্পন্ন অর্থহীন উর্দু কবিতা লেখেন। ১৪ বছর বয়সে Lisanus Sidq 'সত্যের কণ্ঠ' নামে পত্রিকা প্রকাশ করে সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯০৪ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি বার্ষিক ভাষণ দানের জন্যে আঞ্জুমানে হেমায়েত-ই-ইসলাম কর্তৃক লাহোরে আমন্ত্রিত হন। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল "ধর্মের যৌক্তিক ভিত্তি।" তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে উর্দু গল্পকার নাজির আহমদ, কবি হালি এবং আল্লামা ইকবালের মত ব্যক্তিত্বও ছিলেন। তার বক্তৃতা এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সারা ভারতে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। কবি হালি তাঁকে যুবকের কাঁধে বৃদ্ধের মাথা বলে আখ্যায়িত করেন।

যৌবনের মধ্যভাগ ও শেষ দিকে তিনি তার ভবিষ্যৎকর্মপন্থা ঠিক করেন। তার মনে ইসলামই প্রাধান্য পেয়েছে এবং মুসলমান ভাইদের সাহায্যের দিকটিই তিনি বেশী করে ভাবতে থাকেন। এই ভাবে ১৯১২ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সে সাপ্তাহিক আল হিলাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেন। এই উর্দু পত্রিকাটি মুসলিম বিশ্বব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অসৎ উদ্দেশ্যের কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে মূলতঃ জামাল উদ্দীন আফগানীর Al Urwah al Wuthqa-এরই দৃঢ় স্বাক্ষর বহন করে। সাংবাদিকতার মাধ্যমে আবুল কালাম আযাদ নিজেকে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক মেধা হিসেবে প্রমাণ করেন। এই পত্রিকায় খুবই যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যের মাধ্যমে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আলীগড় আন্দোলনের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান শুরু করেন। তিনি আধুনিক শিক্ষা এবং যে কোন ধরনের পশ্চিমী ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে থাকেন। তিনি কি ভারতে রাজনীতির চরমপন্থী অথবা মধ্যপন্থীদের অনুসরণ করছেন কিনা জানতে চাইলে কোন মুসলমান কোন ব্যাপারে অন্য কাউকে অনুসরণ করতে পারে এই ধারণাকে উপহাসের সঙ্গে উড়িয়ে দেন। তারা আল্লাহর বাছাইকৃত ব্যক্তি এবং তাদের জন্যে সুস্পষ্ট পথ রয়েছে। তিনি নিজে কোরআন অনুসরণ করেছেন এবং তার ধর্মাবলম্বীদেরকেও কোরআন অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

দেশব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণে এটি অভূতপূর্ব উৎসাহের সৃষ্টি করে। এই কারণে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ক্ষমাপ্রার্থী মনোভাব ও আধুনিক দর্শনের সঙ্গে ইসলামকে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টার কোন আবেদন রইল না। বৃটিশ কর্তৃক আল হিলাল নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং আবুল কালাম আযাদকে কারাগারে পাঠানোর আগে এর প্রচার সংখ্যা পঁচিশ হাজারে গিয়ে পৌছায়। ১৯২০ সালে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের কারামুক্তি তার জীবনে পটপরিবর্তন আনে। এই সময় তিনি তার ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেন। এজন্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার কোন উদ্বেগ ছিল না। ভারতে একটা সত্যিকার ইসলামী সমাজ গঠনে তিনি আর আগ্রহী ছিলেন না। এর পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তার লক্ষ্যে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তা হয়ে যান।" ধর্মের মধ্যে পুনর্জাগরণ প্রয়োজন যারা বিশ্বাস করেন আমি তাদেরই একজন, তবে সামাজিক বিষয়ে এটা হচ্ছে প্রগতিকে অস্বীকার করা।"

"১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ছিলেন ইসলামী

পুনর্জাগরণ ও খেলাফত আন্দোলনের উৎসাহী প্রবক্তা। কিন্তু পরে তিনি কাজে ও চিন্তায় সম্পূর্ণ পাল্টে যান। তাঁর এই পরিবর্তন এতই অস্বাভাবিক ছিল যে, অনেকে চোখ রগড়াতে থাকেন যে, তাদের দেখা ব্যক্তিটি কি সেই আযাদ না রূপান্তরিত কেউ, যার মধ্যে একটি নতুন মানুষ জন্ম নিয়েছে। আবুল কালাম আযাদ এখন পুরোপুরি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এবং মুসলমান ও অমুসলমানদের নিয়ে একক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সোচ্চার প্রবক্তা। তিনি কতিপয় হিন্দু দার্শনিকের ধর্মীয় ঐক্যের তথাকথিত মতবাদ এবং পশ্চিমা জৈবিক বিবর্তনবাদ মেনে নেন। পবিত্র কোরআনের ওপর তার ভাষ্যে এসব মতবাদের সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়।[২]

জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করলে ভারতের মুসলমানদের মুক্তি হবে এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ভারতে জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করেন এবং মহাত্মা গান্ধীর খুবই ঘনিষ্ঠ সহচরে পরিণত হন।

তিনি ঘোষণা করেন ভারতের মুক্তি এবং বর্তমান বিক্ষোভের জন্যে আমি মহাত্মা গান্ধীর যুক্তির সঙ্গে পূর্ণ একাত্মতা পোষণ করি এবং তার সততায় আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস অস্ত্রের শক্তিতে ভারত সফল হতে পারে না এবং তাকে সেপথে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শও দেয়া যায় না। অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমেই কেবল ভারত বিজয়ী হতে পারে এবং ভারতের বিজয় নৈতিক শক্তির বিজয়ের স্মরণীয় উদাহরণ হয়ে থাকবে।[৩]

১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধী খেলাফত আন্দোলন বন্ধের আহবান জানানোর পর এবং হাজার হাজার মুসলমান নিধনকারী সাম্প্রদায়িক গোলযোগ দমনে তার ব্যর্থতার পর কংগ্রেসের মুসলিম সদস্যদের মধ্যে মাওলানা মোহাম্মদ আলী তার ভাই শওকত আলী এবং কায়েদে আজম এক এক করে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে থাকেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ শুধু থেকেই গেলেন না বরং প্রায় দুই দশকের জন্যে এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ রক্ষকে পরিণত হলেন।

---

২. ১৯৬২ সালের ৩০শে মার্চে লেখা মাওলানা আবুল আলা মওদূদীর ব্যক্তিগত পত্র থেকে উদ্ধৃত।

৩. Mohadeb Desai, Moulana Abul Kalam Azad, George Allen & Urwin, London 1941, P, 82.

জনাব জিন্নাহ অভিযোগ করেন যে, কংগ্রেসের নির্ধারিত নীতি হচ্ছে মুসলিম বিরোধিতা, মুসলমানদের সংস্কৃতি ধ্বংস করা এবং অব্যাহতভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ এবং সব সময় মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার খর্ব করা।

"আমি আগেও বলেছি এবং পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, কংগ্রেস মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কংগ্রেসের নীতি মুসলমান বিরোধী এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার খর্ব করছে এ কথা বলা বিরাট মিথ্যা কথা। যদি মিঃ জিন্নাহ এবং তার সহযোগিরা মনে করেন যে, মুসলমানদের কল্যাণের জন্যে তারা এসব বলছেন। আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বলব যে তারা তার বিপরীত কাজ করছেন। এটাই আজকের সবচাইতে বড় প্রয়োজন।"[৪]

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ভারতে শিক্ষামন্ত্রী হন এবং ১৯৫৮ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের মুসলমানদের জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সত্যিকার ইসলাম ভিত্তিক করার চেষ্টার পরিবর্তে তিনি উর্দু এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার জন্যে ল্যাটিন হরফ চালুর পশ্চিমা ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি পরিবার পরিকল্পনার জন্যে সরকারী প্রচারাভিযানকেও সমর্থন করেন। তিনি বলেন, "জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে জৈবিক ও সামাজিক সমস্যা" এবং ইসলামী আইনের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোন কারণ নেই, যদি বিশেষজ্ঞরা একে জাতির জন্যে অপরিহার্য মনে করেন তবে তারা এর পক্ষে রায় দিতে পারেন।"[৫]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের একনিষ্ঠ অনুসারী করিম চাগলা এই ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে যান। ভারতে শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে তিনি মুসলিম পারিবারিক আইন বিলোপ, বহুবিবাহ, পর্দা নিষিদ্ধ এবং মুসলমান মেয়ে ও অমুসলমান যুবকের বিয়ে বাধ্যতামূলক করে আইন প্রণয়নের জন্য ভারত সরকারের ওপর প্রচন্ড চাপ দিতে থাকেন। জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সাফল্যের জন্যে গর্ভপাত বৈধকরণ এবং তিন সন্তানের পিতার জন্য বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাত্বকরণের পক্ষে প্রকাশ্যে ওকালতি করেন।

---

৪. Desai op. Cit. PP 152-55.

5. Abu Shehab Rafiullah, Islam and family planning, the pakistan times. Dec. 2. 1966.

সমসাময়িক মুসলিম পাণ্ডিত্যের ওপর প্রাচ্যবাদের প্রভাবের একটি উদাহরণ

আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের সবচাইতে আশ্চর্যজনক দিক হচ্ছে কতিপয় মুসলমান পণ্ডিত ইসলামী গবেষণার শ্লোগানের আবরণে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং আচরণ সম্পর্কিত প্রাচ্যবাদীদের বক্তব্যকে কোন প্রকার প্রশ্ন ছাড়াই গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে পড়েন। অন্যতম বিখ্যাত প্রাচ্যবাদী H.A. R GIBB তার Modern Trends in Islam গ্রন্থে আধুনিক খৃষ্টানরা যেভাবে বাইবেলকে গ্রহণ করছেন ঠিক সেইভাবে কোরআনও হাদিসের ব্যাপক ব্যাখ্যা গ্রহণে আধুনিকতাবাদীদের ব্যর্থতার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এতে কোরআনের অলৌকিক উৎসের চাইতে মানবিক দিকই পরিস্ফুটিত হত– এই ছিল তার ধারণা।

আধুনিক প্রাচ্যবাদীদের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম নামধারী পণ্ডিতদেরকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে পবিত্র কোরআন এবং হাদীসের ব্যাখ্যায় উৎসাহিত করা। যাতে তারা পরবর্তী পর্যায়ে প্রমাণ করতে পারেন কোরআন হাদীস নবীর কাছে নাজিল হয়নি, এগুলো তার রচনা অথবা বাইবেলের মত কোরআনও সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তিত হয়েছে। এটা অসম্ভব প্রমাণিত হলে (যা হতে বাধ্য) প্রাচ্যবাদীরা মুসলমান নামধারী পণ্ডিতদেরকে কোরআনের ঐতিহাসিক দিকটির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করবে। যা তাদের মতে নবীর সময়ের আরবের প্রাথমিক অবস্থার জন্যে প্রযোজ্য ছিল এবং বর্তমান যুগের জন্যে তা অপ্রাসঙ্গিক এবং তার কোন চিরন্তন মূল্য নেই। এই ভাবে প্রাচ্যবিদদের প্রভাবে মুসলমান নামধারী পণ্ডিতেরা যদি কোরআনকে অন্যান্য সাধারণ বই এর মত একটি বই মনে করতে শুরু করে তাহলে খোদা না করুন কোরআন পর্যায়ক্রমে তার কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলবে এবং কোরআনের আনুগত্য বা তার প্রতি কেউ সম্মান দেখাবে না।

সৈয়দ আমীর আলীর স্পিরিট অফ ইসলাম (১৯২২) ডঃ তাহা হোসাইনের On Pre Islamic Poetry (১৯২৬) এবং ডঃ ফজলুর রহমানের ইসলাম (১৯৬৬) সুস্পষ্টভাবে একথাই বলেছে। তিনি লিখেছেন : "নবী এবং নবীর ওপর নাজিলকৃত ওহির বক্তব্য স্বাভাবিক এবং কিছুটা উৎসাহ ব্যঞ্জক ছিল। বস্তুতঃ পরে এটাকে প্রায় গোঁড়ামিতে আকীর্ণ করা হয়েছে। এতে জিব্রাইলের বাহ্যত্যের নিশ্চয়তা এবং ওহির লক্ষ্য রক্ষা করতে হতো। আমাদের কাছে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে এই পদক্ষেপ অপরিপক্ক মনে হতে পারে তবে যে সময় গোঁড়ামির প্রাধান্য ছিল তখন এই পদক্ষেপ বিশেষ করে যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক ছাড়া কোন উপায় ছিল না। সাধারণভাবে গৃহীত অনেক হাদীসে নবীকে জন সমক্ষে জিব্রাইলের (আ) সঙ্গে কথা বলতে এবং জিব্রাইল সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। জিব্রাইলের বাহ্যত্ব এবং ওহি সাধারণ মুসলমানদের মনে এতই বদ্ধমূল হয়েছে যে, প্রকৃত ব্যাপারটি অস্বীকৃত হয়েছে। কোরআনে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নবী শেষ সীমা পর্যন্ত দেখতে পান। এর ফলে তার অভিজ্ঞতালব্ধ বাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মহানবীর মেরাজে যাওয়ার বিষয়টি গোঁড়াদের তৈরী। যীশুর স্বর্গারোহণের ধারণা থেকেই তারা এ বিষয়টি অবতারণা করেছে। যার প্রমাণ হিসেবে তারা হাদীসের উদ্ধৃতি দেন। হাদীস ঐতিহাসিক উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং বিভিন্ন সূত্র থেকেই তার উপাদান এসেছে, (পৃঃ ১৪)। যদিও ওহির বিষয়কে কোরআনে আধ্যাত্মিক ব্যাপার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীস বা প্রাচীন পন্থায় গোঁড়ামি এমন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা বা অলঙ্কৃত করা হয়েছে, হাদীস নির্ভর ধর্মতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের দ্বারা বলা হয়েছে কর্ণ এবং বাহ্যিকভাবে নবী ওহি পেয়েছেন এবং জিব্রাইল অন্তরের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছেন বলে বলা হয়েছে।" (পৃঃ ৩১-৩২)

বিজ্ঞ লেখক পবিত্র কোরআনের আরও কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং বিধি নিষেধ আরোপের দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

এইসব ঘটনা প্রাক ইসলামী যুগের গল্প এবং রূপকাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ হওয়ায় খুবই আনন্দদায়ক তবে সংকটাবিষ্ট। কোরআনের ভবিষ্যৎ বাণীর ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলে বলা যায় প্রকৃত বিষয় নির্ণয়ে এবং নবীর

বাণী আমদানীতে এগুলো খুবই অর্থবহ। যে সবক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহৃত এবং এর ফল অর্জিত হয়েছে তার আলোকেই এগুলো বিচার্য। অপরদিকে মুসলমানদের উচিৎ নয় এগুলোর ঐতিহাসিক আবেদনে ভীত হওয়া বা প্রত্যাখ্যান করা। কোরআন অবশ্যই বলে যে, এসব গুল্প সত্যিই নাজিল হয়েছে। তবে অবশ্যই যা নাজিল হয়েছে, তা হচ্ছে তার বক্তব্য এবং উদ্দেশ্য। (পৃঃ ১৬)

অপর কথায় বিজ্ঞান লেখক পরোক্ষে বোঝাতে চেয়েছেন যে, পবিত্র কোরআনে নবীর সম্পর্কে যে কাহিনী বলা হয়েছে এগুলোকে ওহি হিসেবে গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই। সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও লেখক ইসলামের মৌলিক এবাদতের ওপরও হামলা করতে কুণ্ঠা করেননি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথা কোরআনে বলা হয়নি। নবীর পরবর্তীকালে কোন বিকল্প ছাড়াই পাঁচ ওয়াক্ত নামায অনমনীয়ভাবে নির্ধারণ করা হয়। মৌলিক তিন ওয়াক্ত হাদীসের স্রোতে বিলীন হয়ে যায়। এসব হাদীস ও সুন্নার যথার্থতা সম্পর্কে ডঃ ফজলুর রহমানের তীব্র আক্রমণ Joseph Schacht এর the origin of Mohammadan jurisprudence-এর বক্তব্য থেকে স্বতন্ত্র নয়– মৌলিক বিষয়ের বাইরে নবীর সুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের নৈতিক জীবনের ওপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। .....সামগ্রিক বিষয় থেকে বোঝা যায় যেখানে নবীকে ডাকা হয়েছে সিদ্ধান্ত নেয়া অথবা কর্তৃত্ব ঘোষণার জন্যে বা তিনি যেতে বাধ্য হয়েছেন সবগুলোই ছিল অন্তর্বর্তী বা বিশেষ পরিস্থিতি। সাধারণ পরিস্থিতিতে মুসলমানেরা তাদের দৈনন্দিন ব্যবসা ও সামাজিক লেনদেনের সমস্যা নিজেরাই মীমাংসা করেছে। (পৃঃ ৫১)

অতএব সুন্নত যদিও নবীর আচার আচরণ হিসেবে ধরা হয় তার বিষয়বস্তু কিছু না কিছু পরিবর্তন হতে বাধ্য এবং এর অধিকাংশই সম্প্রদায়ের প্রথমাবস্থার অনুশীলন থেকে এসেছে। তবে চলমান সম্প্রদায়ের প্রকৃত অনুশীলন, সংযোজনের দ্বারা পরিবর্তন হতে বাধ্য। প্রাথমিক ইসলামী সমাজের মত একটি দ্রুত সম্প্রসারণশীল সমাজে প্রায়ই নতুন প্রশাসনসহ নতুন নৈতিক ও আইনগত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। নৈতিক বিষয়ের উত্তর দিতে হবে এবং আইনগত পরিস্থিতির সমাধান করতে হবে। যা কিছু নতুন চিন্তা

বা উদ্ভাবনা করা হয়েছে তাকে কোরআন এবং হাদীসের আলোকে একটা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এইসব ব্যাখ্যা প্রথম দিকে ব্যক্তিগত মতামত ছিল কিন্তু দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে এগুলো নিয়মিত সিদ্ধান্তের জন্যে অনুকরণীয় হয়ে পড়েছে। (পৃঃ ৫৬)

আধুনিক ইসলাম সৃষ্টিশীল প্রেরণায় উন্মুখ এবং নতুন অগ্রগতির জন্যে কতিপয় গ্রুপের আবির্ভাব হয়েছে যারা সকল হাদীস বাতিল করতে চায় এবং কোরআনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে চায় না। তবে এইসব গ্রুপ বিষয়টির প্রকৃত বিপদ সম্পর্কে সজাগ নয়। কারণ সকল হাদীস অস্বীকার করলে এক মুহূর্তেই কেরআনের ঐতিহাসিক ভিত্তি শেষ হয়ে যায়। তবে বর্তমান অস্থিরতা খুবই স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়। নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা ঠেকিয়ে রাখা যায় না এবং তা সম্ভবও নয়। এটা খুবই বাঞ্চনীয় যে মুসলমানেরা তাদের হাদীসের অগ্রগতির একটা খোলাখুলি এবং দায়িত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ চালাবে।" (পৃঃ ৬৬-৬৭)

এইভাবে লেখক কোন যৌক্তিকতা ছাড়াই ইসলামের কার্যকারিতা এবং মানব জীবনের ব্যাপক পথ নির্দেশিকা হিসাবে ইসলামের পারদর্শিতার বিরুদ্ধাচারণের চেষ্টা করেন। কারণ হাদীস এবং সুন্নাহ যদি মহানবীর সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য শিক্ষা না হয়ে থাকে তাহলে তার জায়গায় খেয়াল খুশির জগাখিচুড়ি ছাড়া আর কি পেশ করা যাবে? এই বিভ্রান্তিকর বুদ্ধিমত্তার পরিণতি হচ্ছে- "বহুবিবাহ এবং দাস প্রথার উদাহরণ থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয় যে, কোরআনের আইন মানবিক মূল্যবোধের প্রগতির দিকে নতুন আইন গ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। অপর কথায় কোরআনের কিছু আইন তখনকার সমাজের কিছু আইনকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোরআনের আইনকে কোরআন নিজেই অবিনশ্বর করেনি।

খুব শীগগীরই মুসলমান আইনবিদ এবং যুক্তিহীন লোকেরা বিষয়টিকে এলোমেলো করে ফেলে এবং কোন বাছ-বিচার ছাড়া যে কোন সমাজে কোরআনের বিধান প্রয়োগের কথা চিন্তা করেন। প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা কোরআনকে অনেক উদারতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সপ্তম শতকের শেষার্ধের প্রথম দিকে

এবং অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত আইন শাস্ত্রের উন্নতির পর ঐতিহ্যের সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি ও সাদৃশ্যপূর্ণ বিচার শক্তি জাগ্রত হওয়ার ফলে আইনবিদরা পবিত্র গ্রন্থের মূল পাঠকে আঁকড়ে ধরে। আন্তরিকতাবাদের প্রভাবে মুসলিম আইন এবং ধর্মতত্ত্বের সমাধি হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।" (পৃঃ ৩৯-৪০)

একটি হাদীসকে মিথ্যা হতে হলে হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী অথবা তার থেকে যিনি শুনেছেন তাকে মিথ্যুক হতে হবে। সাহাবীদের বেলায় এটা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিষয়টির মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। মহানবীর ব্যক্তিত্ব এসব মানুষকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে, এইসব নারী পুরুষ মানব ইতিহাসের সুবিদিত সত্য এবং ইতিহাসে এদের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এটা কোন রকমেই বিশ্বাসযোগ্য নয় যারা আল্লাহর নবীর কথায় নিজেদের জীবন এবং তাদের সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন তারা সেই নবীরই কথা নিয়ে চাতুরী করবেন। নবী বলেছেন, "যারা স্বেচ্ছায় আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে তারা দোজখের বাসিন্দা হবে।" সাহাবীরা এটা জানতেন। আল্লাহর দূত হিসেবে তারা যাকে বিশ্বাস করেছিলেন সে নবীর কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন।

মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এটা কি সম্ভব যে তারা নিশ্চিত শাস্তিকে অবিশ্বাস করেছেন? আরও একটি যুক্তির ভিত্তিতে হাদীসের যথার্থতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। যে সাহাবী নবীর কথা শুনেছেন অথবা যারা পরে বর্ণনা করেছেন তারা ভুল শুনতে পারেন অথবা স্মরণশক্তির অভাবে ভুল করতে পারেন বা বুঝতে ভুল করতে পারেন। তবে মনস্তাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে এ ধরনের ভুলের কোন অবকাশ অন্ততঃ সাহাবীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যারা নবীর সঙ্গে বাস করেছেন, তাদের প্রতিটি কথা এবং কাজ উল্লেখযোগ্য ছিল। এটা শুধু এ কারণে নয় যে, তার প্রতি অগাধ ভক্তি ছিল বরং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, নবীর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিটি আদেশের আলোকেই তাহাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষণ পরিচালিত করতে হবে। এই কারণে নবীর কোন কথাকে তারা হাল্কাভাবে নেননি বরং ব্যক্তিগত চরম অসুবিধা সত্ত্বেও তা স্মরণ রাখতে চেষ্টিত ছিলেন।

নবীর সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন তারা প্রত্যেকেই দুইজন করে গ্রুপে থাকতেন এবং একজন পালাক্রমে নবীর কাছে থাকতেন এবং অপরজন তার জীবনোপকরণ সংগ্রহ করতেন। যিনি কাছে থাকতেন নবীর কাছ থেকে শোনা এবং নবীর আচরণ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখা মাত্রই অবহিত করতেন। প্রতিটি মুহূর্তে তারা এতই সচেতন ছিলেন যে নবীর কোন কাজই তাদের দৃষ্টির আড়ালে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় কি করে বিশ্বাস করা যায় যে, হাদীসের সঠিক শব্দ সম্পর্কে তারা উদাসীন ছিলেন? শত শত সাহাবীর পক্ষে প্রতিটি খুটিনাটি বানানসহ পুরো কোরআন মনে রাখা যেমন সম্ভব ছিল ঠিক তেমনি কোন প্রকার বর্জন, সংযোজন ছাড়া হাদীস মনে রাখাও সম্ভব ছিল। পূর্ব এবং পশ্চিমের আধুনিক সমালোচকরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে সংবেদনশীল সমালোচনা করতে পারেননি।

এটা করা কষ্টকর কারণ হাদিসের প্রাথমিক সংকলকরা বিশেষ করে ইমাম বুখারী এবং মুসলিম হাদীসের যথার্থতার জন্যে মানবের সাধ্যানুসারে যা কিছু করণীয় ছিল সবকিছু করেছেন। তারা যে কষ্ট স্বীকার করেছেন কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক কোন ঐতিহাসিক ঘটনার যথার্থতার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করেন না। এখন পর্যন্ত কোন সমালোচকই যথার্থ হাদীসের কোনটির অযথার্থতা সম্পর্কে কোন প্রমাণ দিতে পারেননি। কোন যথার্থ আচারের পূর্ণাংশ বা অংশ বিশেষ প্রত্যাখান সংবেদনশীলতার পরিচায়ক নয়। কারণ পক্ষপাতশূন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা তা প্রকাশ সম্ভব হয়নি। তবে আমাদের যুগের অনেক মুসলমানের এই বিরোধী মনোভাবের উদ্দেশ্য সহজেই বোঝা যায়। আমাদের নবীর সুন্নায় প্রতিফলিত ইসলামের সত্যিকার মেজাজের সঙ্গে বর্তমানের অধঃপতিত জীবনকে খাপ খাওয়াতে না পারাই এই বিরোধিতার উদ্দেশ্য। নিজের এবং পরিবেশের অসম্পূর্ণতাকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার জন্যেই হাদীসের ভিত্তিহীন সমালোচকরা সুন্নত অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা এড়াতে চান কারণ এটা করা সম্ভব হলে তাদের খেয়াল খুশিমত কোরআনের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে।

এইভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পদ্ধতি হিসেবে ইসলামের ব্যতিক্রমী অবস্থান ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। একই সঙ্গে নবীর সুন্নাহর অনুসরণ ও পশ্চিমা জীবন পদ্ধতিরে স্বাদ গ্রহণ অসম্ভব। এই পশ্চিমী ধ্যান ধারণার

কারণেই আমাদের নবীর আদর্শ সুন্নাহর সমগ্র কাঠামো আজ এত অপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুসারীরা সুন্নাহর বিরোধিতা ছাড়া কোন পথ খুঁজে পায় না। তারা বলেন সুন্নাহ অপ্রাসঙ্গিক, সুতরাং তা ইসলামের অপরিহার্য দিক নয়। কারণ তা অনির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এরপর কোরআনের শিক্ষাকে পাল্টিয়ে দেয়া সহজ হয়ে পড়ে। তখন তারা পশ্চিমা সভ্যতার সাথে খাপ খাইয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা করতে পারেন।

শরিয়তের অগ্রগতি সংক্রান্ত ডক্টরের বক্তব্য যোশেফ স্কচ্ এর ধারণার শব্দান্তরিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। স্কচের মতবাদ হচ্ছে প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা অনেকটা স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন বিচার শক্তির অধিকারী ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী প্রথম মুসলিম আইনবিদ যিনি ইসলামী শরিয়তের জন্যে কোরআনের পর হাদীসকেই সব চাইতে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আইনকে আরও জোরদার করার জন্যে তিনি সাহাবীদের 'ইজমা'কে অভ্রান্ত নির্দেশিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ইজতেহাদের যোগ্যতা এত নিষ্পাপ ও কঠোর এবং উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে যে, মানুষের পক্ষে তা অর্জন অসম্ভব। প্রাথমিক যুগের ধর্মীয় নেতারা সেই হিসেবে নিজেদেরকে খুবই আদর্শবান করে গড়ে তুলেছিলেন। পুরোপুরি ইজতেহাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলোপ করা হয়েছে। প্রাথমিক ইজতেহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে -এর অর্থ হচ্ছে একজন তার নিজস্ব চিন্তার গণ্ডির মধ্যে আইনের ব্যাখ্যা দিতে পারেন অথবা বিভিন্ন চিন্তার বিশ্লেষণ করে আইনের ওপর তুলনামূলক গবেষণা চালিয়ে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ খাড়া করতে পারেন। ইবনে তাইমিয়ার মত অসাধারণ লোকের সংখ্যা খুব দুর্লভ, যারা পুরোপুরি ইজতেহাদের দাবী করেছেন। কিন্তু মধ্যযুগে এ ব্যাপারে তাদের স্বীকৃতি খুবই সীমিত ছিল। আমরা পরে দেখব যে, আধুনিক চিন্তানায়কদের প্রবল প্রচেষ্টায় এই দিকটি আবার কিভাবে শুরু হয়েছে। কিন্তু সমগ্র মধ্য শতাব্দী ধরে আইনের সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা সম্প্রদায়ের ওপর শেলের মত নিক্ষিপ্ত হয়েছে। (পৃঃ ৭৮-৭৯)

এখন আমরা সংক্ষেপে দেখব যে, মহান আইনবিদদের সর্বসম্মত মতের বিরুদ্ধেই ইজতেহাদ করা যায় কিনা ? এই বিষয়ের দুইটি দিক আছে

তাত্বিক এবং বাস্তব। তাত্বিক দিক থেকে এ ধরনের ইজতেহাদের ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকতে পারে না, যেহেতু আমাদের খ্যাতনামা ইমামরা অভ্রান্ত ছিলেন না তাদের সর্বসম্মত মতে ভুলের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, তাত্বিক দিক থেকে যা সম্ভব তাই সত্যি হওয়া অপরিহার্য নয়। উদাহরণস্বরূপ আমাদের সময় আল্লামা ইকবাল দেশের সবচাইতে বড় কবি। এমন কোন কবির আবির্ভাব অসম্ভব নয় যিনি ইকবালের চাইতেও নিজেকে বড় প্রমাণ করবেন। ইকবালের চেয়ে বড় কবির আবির্ভাব সম্ভব এটা ধরে নেয়ার পর ডঃ ফজলুর রহমান নিজেকে সেরূপ দাবী করেন। কবিত্বের দাবির কোন কাজ বা প্রমাণ উপস্থাপন না করলে তার মুখের কথাকে বিশ্বাস করা কি কারও পক্ষে সম্ভব ? এখন কথা হচ্ছে, যে বিষয়ে আবু হানিফা, মালিক, শাফী এবং আহমদ ইবনে হাম্বলের মত ইমামগণ সম্পূর্ণভাবে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন সে বিষয়ে কোন মুসলমানের পক্ষে আধুনিকতাবাদীদের ফতোয়া বিবেচনা করা কি সম্ভব ?

ইসলামের ইতিহাসের বিচার বিশ্লেষণ ডঃ ফজলুর রহমান H.A.R. Gibb's এর Mohammadism কে অনুসরণ করেছেন। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে গিবস্ এর বই এর চাইতে ফজলুর রহমানরে বইতে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আধুনিক সংস্কার আন্দোলনের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, মধ্যযুগীয় কর্তৃত্ব এবং ইজতেহাদের ওপর তাদের জেদকে অস্বীকার করে তারা আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। কিন্তু যেহেতু আগের আন্দোলনগুলো কর্তৃত্ব পরিহার করার সময় ইসলামী আইনে সংযোজনযোগ্য কিছু দিতে না পেরে শুধুমাত্র প্রাচীন ইসলামে ফিরে যেতে চেয়েছে ফলে এই শূন্যতা আধুনিকতাবাদীরা পশ্চিমা সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক উপাদান দিয়ে পূরণ করেছে। (পৃঃ ২১৫)

তিনি নৈতিক প্রত্যক্ষবাদের পরামর্শ দান এবং পার্থিব আত্মিক আন্দোলনের পরিবর্তে সমাজ কল্যাণের ওপর জোর দেয়ার কথা বলেছেন ফলে পরে আধুনিক জীবন ও শিক্ষার ওপর ধর্মনিরপেক্ষবাদ বলবৎ হয়েছে। এইসব আন্দোলন আধুনিকতার অগ্রপথিক এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিকর। পার্থিব সুখ-শান্তির জন্য পরকালকে বিসর্জন দেয়া তাদের লক্ষ্য ছিল না। বরং তা

ছিল জীবন পদ্ধতি হিসেবে নিখুঁত ও নির্ভেজাল ইসলামের বাস্তবায়ন। অপরদিকে আধুনিকতাবাদীরা মুসলিম সমাজকে পশ্চিমারূপ দিয়ে কি করতে চান তা আর গোপন নেই।

ডঃ ফজলুর রহমানের ধারণা ঐতিহাসিকভাবে উন্নয়ন প্রাপ্ত আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি মুসলমানদের নিশ্চলতা, দুর্বলতা এবং অধঃপতনের জন্য বিরাট অংশে দায়ী। সকল প্রাক আধুনিক শিক্ষার মত মধ্যযুগের মুসলমানদের শিক্ষার মৌলিক গলদ ছিল শিক্ষার ধারণা সংক্রান্ত। আধুনিক শিক্ষার ধারণা হচ্ছে-তা অবশ্যই অনুসন্ধান এবং আবিস্কারের ফসল হতে হবে। মুসলমানরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করতেন। তাদের মতে শিক্ষা অর্জন করতে হবে– এই মনোভাব নিস্ক্রিয় এবং ধারণক্ষম। সৃষ্টিশীল ও ইতিবাচক একদিকে প্রেরিত বা চিরাচরিতের বিরোধিতা অপরদিকে যৌক্তিকতার কারণে মুসলিম বিশ্বে এই বৈপরিত্য এখন আরও তীব্র। এই বিতর্ক, গোঁড়ামি, ঐতিহ্য রক্ষার উদ্বেগ সামগ্রিকভাবে যুক্তির বিরুদ্ধে মাথা চাঁড়া দিয়েছে যাকে সে অন্ধত্বের কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিল। (পৃঃ ১৯১)

বিজ্ঞ ডক্টর জানতে আগ্রহী হতে পারেন, কি করে বর্তমান শতকের প্রথম দিকের খ্যাতিম্যান খৃষ্টান মিশনারী Dr. Samuel zwemer একইভাবে মুসলিম শিক্ষার সমালোচনা করেছেন; ঠিক এখানে তাদের শিক্ষা দর্শনের চূড়ান্ত গলদে আমরা হোঁচট খাই। স্মৃতি শক্তিকে খুবই জোরদার করা হয়েছে কিন্তু যুক্তিবাদী ক্ষমতা একেবারে অনুন্নত রয়েছে। একজন মুসলিম প্রতিদিন যা আবৃতি করে, সে জানে না ঐ শব্দ এবং বাক্যে কি বোঝায়। কোরআনের বক্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে গাল খেতে হবে অথবা তার চাইতে বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। এমনকি মোহাম্মদীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস এবং ধর্মতত্ত্বও মুখস্ত করানো হয়। যেহেতু গোঁড়ামি অধ্যাপককে ব্যক্তিগত বিচার বিচক্ষণতা প্রয়োগের সুযোগ দেয় না, সেক্ষেত্রে ছাত্ররা কেন নিজেদের জন্যে চিন্তা করবে ? আল্লাহ ওহির ১১৪টি অধ্যায়ে জ্ঞানের আরম্ভ এবং শেষ, অন্য পাঠ্য বইয়ের প্রয়োজন কোথায়* ?

* Childhood in moslem world. Dr. samuel M. zwemer Fleming H. Revell co. New york, 1915 pp 137-38.

চিরাচরিত মাদ্রাসা শিক্ষা-যেখানে বুঝার পরিবর্তে শুধু মুখস্ত করার ওপর জোর দেয়া হয় তার বেলায় এই সমালোচনা সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ডঃ ফজলুর রহমান এবং তার সহানুভূতিশীলরা দেশীয় পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে যে আধুনিক শিক্ষা দিতে চান তা কি কোন ভাল কিছু করতে সক্ষম ? বস্তুতঃ ডঃ ফজলুর রহমান নিজে এর উত্তর দিয়েছেন। তার বই-এর সমাপ্তিতে তিনি লিখেছেন- প্রথম অবস্থা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষায় নতুন পদ্ধতি সৃষ্টির পরিবর্তে একটি ধারণা দিয়ে এসেছে, ফলে সেখানে অনুসন্ধিৎসা বা স্বাধীন চিন্তার কোন সুযোগ নেই। আমাদের আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যেও এই প্রয়োজনীয় প্রেরণা পর্যাপ্তভাবে সঞ্চারিত হয়নি। আমাদের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পুরোপুরি ধর্ম নিরপেক্ষ এবং ইসলাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কখনো এতে স্থান পায়নি। ফলে আমাদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ইসলামের কোন জ্ঞান নেই।

দ্বিতীয়তঃ এই শিক্ষা পদ্ধতির যেসব ছাত্র বৈজ্ঞানিকভাবে ইসলাম অধ্যয়নে যত্নবান হলেন তারা প্রায় সকলেই পশ্চিমী প্রাচ্যবাদের শিষ্য। ফলে তাদের মুসলমান শিষ্যরাও প্রাচ্যবাদী হয়ে পড়েছে। প্রাচ্যবাদীরা একই সঙ্গে মুসলমানও রয়ে গেলেন। সামগ্রিকভাবে এতে কোন কাজ হয়নি এবং কোন ফলোদয় হয়নি। (পৃঃ ২৫১-৫২)

বিষয়টির সবচেয়ে জটিল অবস্থা হচ্ছে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত আধুনিকতাবাদীরা ইসলামে পণ্ডিত নয় এবং ইসলামের অতীতের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। সুতরাং কলহপ্রিয় সংস্কারবাদীদের মোকাবিলায় তারা আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করেন। ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদের ওপর আধুনিকতাবাদীদের একটি বইও নেই। (পৃঃ ২৩০)

পশ্চিমী শ্রেণী পর্যাপ্ত সময়ের অভাবে সংস্কৃতির দিক থেকে ঐতিহ্যবাদীদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। পশ্চিমী আধুনিকতাবাদ অপশ্চিমী পরিবেশে উৎকর্ষ সাধন করতে পারে না। এমনকি আধুনিক ক্ষেত্রেও নয় কারণ নতুন পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে এর সময় লাগে। সমসাময়িককালে খুব সীমিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু অগ্রগতি হয়েছে যেমন ইসলামের পুনঃব্যাখ্যা, সৃষ্টিশীল পণ্ডিতদের প্রশিক্ষণ এবং আলআজহারকে পুনর্গঠনের জন্যে পাকিস্তানে ইসলামী রিসার্স ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য এর ফল পেতে সময়

লাগবে। তবে সময়ের প্রাচুর্যতার অভাবই সব কথা নয়। পশ্চিমীবাদের মৌলিক অসুবিধা হচ্ছে এর নৈতিকতার অভাব যা একাই এর শক্তি যোগাতে পারতো। কেবলমাত্র আধুনিকতার কয়েকটি কার্যকর দিক প্রয়োজনীয় নৈতিকতা দিয়ে নতুন জায়গায় আসন পেতে পারতো। কার্যকর আধুনিকতা সৃষ্টি হয়নি, মৌলিকত্বের শক্তিই পশ্চিমীবাদের দুর্বলতা।

(পৃঃ ২২২-২২৩)

এখানে লেখক খোলাখুলি স্বীকার করছেন যে, আধুনিকতার আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। তুরস্কের মত এত ব্যাপকভাবে কোথাও এই ব্যর্থতা আসেনি। সম্পূর্ণ পশ্চিমী ধ্যান ধারণার অধিকারী শাসকদল ৪০ থেকে ৪৫ বছর সেখানে শাসন করেছেন। কামালবাদীরা শুধুমাত্র একজন বিচক্ষণ নেতার নেতৃত্বই পায়নি বরং এই লক্ষ্য অর্জনের কাজে সকল একনায়কের সমর্থন পেয়েছে। এই বইতে ডঃ ফজলুর রহমান আরও স্বীকার করেছেন যে, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ কর্মসূচী পরিচালিত হয়েছে। এই কারণে সরকারী শিক্ষানীতির দ্বারা তুর্কী শহরগুলো প্রভাবিত হয়েছে। কামাল আতাতুর্কের শাসন থেকে তুর্কী বুদ্ধিজীবীরা ধর্মনিরপেক্ষতার কোন উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা দেননি। (পৃঃ ২২৪)

এর অর্থ হচ্ছে মুসলমাননের উপর বর্বর অত্যাচার এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পশ্চিমীবাদ চাপিয়ে দেয়া যায়। কোন মুসলিম দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাশ্চাত্যকরণকে স্বাগত জানায়নি।

এসব সত্যকে অস্বীকার করে তিনি ঘোষণা করেন 'তৃতীয় থেকে নবম শতক পর্যন্ত মুসলমানরা যেসব অবস্থার মোকাবিলা করেছে বর্তমান মুহূর্তে ইসলাম সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা এবং এর পুনর্গঠন অনেক বেশী প্রয়োজন, প্রথম আড়াই শতকে যা করতে হয়েছে এখনও তাই করা প্রয়োজন। অপর কথায় মুসলমানদের নবীর সময়কালের পরবর্তী সময়ের মত এখন চিন্তা করতে হবে এবং একে পুনরায় পুনর্গঠন করতে হবে। (পৃঃ ২৫১)

এই বইয়ের লেখকের মত আধুনিকতাবাদীদের প্রবল শ্লোগান হচ্ছে সৃষ্টিশীল আদি ও স্বাধীন অনুসন্ধানের জন্যে ইজতিহাদ এবং ইসলামী গবেষণা চালাতে হবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এর ফলে কি পাওয়া গেছে ?

এমনকি নিজের পাণ্ডিত্যের মাপকাঠিতে ডঃ ফজলুর রহমান উদ্দেশ্য সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার কুরআন সম্পর্কিত অধ্যায়ে তিনি স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অতি প্রাকৃতবাদ বিরোধিতা মেনে নিয়েছেন, হাদীস এবং শরীয়তের অগ্রগতি সম্পর্কে Schacht -এর আধুনিকতার যুক্তি সৈয়দ আমীর আলীর Spirit of Islam এবং ইসলামের ব্যাখ্যা Wilfred Centwell Smith-এর Islam in Mordern History-র বক্তব্যকে সমর্থন করেছে। অপর কথায় পাকিস্তানের সরকারী ইসলামিক রিসার্স ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডঃ ফজলুর রহমানের মত পণ্ডিত ব্যক্তি আদি সৃষ্টিশীল এবং স্বাধীন চিন্তার সামান্য পরিচয়ও দিতে পারেননি। তার কম বুদ্ধিমান অনুসারীদের কাছ থেকে কি আর আশা করা যায়?

জিয়া গোকল্‌প : কামাল আতাতুর্কের অগ্রসেনা

মৃত্যুর পাঁচ দশক পরও জিয়া গোকলপ (Ziya Gokalp) তুরস্কের আধুনিক চিন্তানায়কদের মধ্যে খুবই প্রভাবশালী রয়ে গেছেন। ১৮৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করে তিনি ইস্তাম্বুলের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন এবং পরবর্তীকালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক হন। ১৯১১ সাল থেকে ১৯২৪ সালে মৃত্যু পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত তিনি তার সমস্ত রচনা লিখেন। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে জিয়া গোকল্‌পই ছিলেন আধুনিক তুর্কী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছাড়া কামাল আতাতুর্কের আমূল সংস্কার বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না।

ঊনিশ শতক পর্যন্ত তুর্কীরা নিজেদেরকে প্রথমতঃ মুসলমান মনে করতো। তাদের আনুগত্য ছিল ইসলামের প্রতি, উসমানিয়া রাজ্যের প্রতি নয়। এমনকি উসমানিয়া শব্দটার অর্থ জাতীয় নয় বরং বংশানুক্রমিক বোঝায়। অতীতের ইসলামী সাম্রাজ্য উমাইয়া, আব্বাসীয়, সেলজুক এবং অন্যান্য বড় সাম্রাজ্যের মত এটাও বংশীয় সাম্রাজ্য। জাতীয় এবং দেশ প্রেমিক হিসেবে উসমানীয় জাতি এবং একটি উসমানীয় স্বদেশের ধারণা ঊনিশ শতকে ইউরোপীয় প্রভাব থেকে আসে। তা হচ্ছে সংক্ষেপে সে যে ভাষায় কথা বলে, যে অঞ্চলে বাস করে যে জাতি থেকে তার জন্ম তা ব্যক্তিগত আবেগ অথবা সামাজিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে তবে রাজনৈতিক সম্পর্ক নয়। সুতরাং ইসলামের সঙ্গে পূর্ণ সংহতির ফলে তুর্কী জাতীয়তা বিলীন হয়ে গেছে। ইসলামের ভিতরে পৃথক বংশোদ্ভূত এবং সংস্কৃতির অধিকারী হিসেবে আরব এবং পারসীদের মত তাদের কোন পৃথক সত্তা ছিলনা। আরব এবং পারসীদের মত তুর্কীরা জাতীয় স্বাতন্ত্রের সামান্য পরিচয়ও প্রকাশ করেনি।

প্রাক ইসলামী তুর্কীরা অসভ্য ছিল না বরং তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র, ধর্ম এবং সাহিত্য ছিল। তবুও খণ্ডিত বিখণ্ডিত না হওয়ার জন্যে ইসলাম সবকিছুই

ভুলিয়ে দিয়েছে এবং মুছে ফেলেছে। অমুসলিম আরবদের পৌত্তলিক বীর, ইরানের বিলুপ্ত প্রায় সম্রাটদের পারসী ঐতিহ্য অথবা মিশরে ফেরাউনের ভগ্ন কিন্তু বিরাট স্মৃতিস্তম্ভের ঐতিহ্য তুর্কীদের নেই। কিছু লোক কবিতা এবং বংশানুক্রমিক পৌরানিক উপাখ্যান ছাড়া তুর্কীদের প্রাক ইসলামী সকল ঐতিহ্য ভুলিয়ে দিয়েছে। এমন কি তুর্ক নামটাও যা এক অর্থে ইসলামিক। ...এমনকি সহস্র বছরের তুর্কী ভাষাও ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এই কারণে আজ তুর্কীদের বংশোদ্ভূত তুরস্কের অমুসলমান নাগরিকদের জন্যে তুর্কী শব্দ কখনো প্রযুক্ত হয় না। উসমানীয়দের কোন গোত্রীয় অহমিকা বা বিশেষত্ব, খাটি তুর্কী বংশোদ্ভূতের ওপর জোরাজুরি নেই। ইসলাম আলবেনিয়া, গ্রীক, শ্লাভ এবং কুর্দ ও আরবদের সত্যিকার শক্তি ও সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে[১]।"

এই সৌভাগ্যজনক ঐতিহাসিক অগ্রগতি তুর্কীদেরকে বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে আগ্রহী মুসলমান এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ইসলামের মর্যাদা রক্ষকে পরিণত করেছে। জাতীয়তাবাদীরা তা সহ্য করতে পারেনি। Halide edib adivar-এর ভাষায় "জিয়া গোকল্প এমন এক নতুন তুর্কী জাতি গঠন করতে চেয়েছিলেন যা উসমানীয় তুর্কী এবং পৌত্তলিক পূর্বপুরুষ তুরানীদের পার্থক্য দূর করবে। তিনি বিশ্বাস করতেন আরবদের প্রতিষ্ঠিত ইসলাম আমাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে কখনও খাপ খাবে না। বংশীয় সূত্র থেকে তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে প্রাক ইসলামী তুর্কী ইতিহাস থেকে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি চেয়েছিলেন আমাদের জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধর্মের সংস্কার করতে।"

জিয়া গোকল্প পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের জন্যে মুসলিম বিশ্বের প্রথম সুবিন্যস্ত প্রচেষ্টার দাবী করতে পারেন– "এখন তুর্কীদের কাজ হচ্ছে জনগণের মধ্যে প্রাক ইসলামী যুগের যে তুর্কী ঐতিহ্য রয়েছে তা উন্মুক্ত করা এবং সামগ্রিকভাবে পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণ করা। ইউরোপীয়দের সঙ্গে সামরিক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পে সমতা অর্জনের জন্যে আমাদের একমাত্র পথ হচ্ছে পশ্চিমী সভ্যতাকে পুরোপুরি গ্রহণ করা।"

---

১. The emergence of modern turkey, bernard lewis, Oxford University press, 1961.

জিয়া গোকল্‌প উম্মা বা ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ধারণাকে অস্বীকার করেছেন কারণ তা পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের বিরোধী।

প্রাক-ইসলামী তুর্কীদের সবচাইতে বেশী দেশপ্রেম ছিল। অতীতের মত ভবিষ্যতেও তুর্কীদের নৈতিকতার ভিত্তি হওয়া উচিৎ দেশপ্রেম, কারণ জাতি এবং আত্মাই শেষ পর্যন্ত স্বকীয় সত্তার বিকাশস্থল। ধর্ম এবং পরিবারের প্রতি আনুগত্যের চাইতে জাতির প্রতি আনুগত্য আগে প্রয়োজন। জাতি এবং স্বদেশকে তুর্কীদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমরা প্রকৃত সভ্যতা– একটি তুর্কী সভ্যতার সৃষ্টি করব যা নতুন জীবনের সঞ্চার করবে। তুর্কীরা আর্যদের চাইতে ফর্সা এবং সুন্দর, মঙ্গোলীয়দের সাথেও তাদের সম্পর্কের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তুর্কী গোত্র অন্যান্য গোত্রের মত সুরাসার বা লাম্পট্য থেকে সৃষ্টি হয়নি। সমরক্ষেত্রের ঐতিহ্য নিয়ে তুর্কীরক্ত সতেজ ও পূর্ণ যৌবন নিয়ে সচল রয়েছে। তুর্কী বুদ্ধি লয়প্রাপ্ত হয়নি। তার আবেগ দুর্বল হয়নি। তুর্কী সংকল্পে ভবিষ্যৎ বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।" (IBID পৃঃ ৩০২, ২৭১ এবং ৬০)। পশ্চিমী সভ্যতাকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য জিয়া গোকল্‌প যুক্তি দিয়েছেন– পশ্চিমী সভ্যতা প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার পরবর্তী রূপ। তুর্কীরা ছিল ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। ইতিহাসে প্রাচীন যুগের আগে তুরানী যুগ ছিল। সেই দিক থেকে পশ্চিম এশিয়ার আদি বাসিন্দারা আমাদের পূর্ব পুরুষ। এইভাবে আমরা পশ্চিমী সভ্যতার অংগ এবং এতে আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ রয়েছে। (IBID পৃঃ ২৬৬-৭)।

ইতিহাসের এই বিকৃতির ফলে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা কামাল আতাতুর্কের শাসনামলে দাবী করলেন যে, অতীতের সকল মহান ব্যক্তি তুর্কী ছিলেন অথবা তুর্কীরা তাদের সভ্য করেছে। ফিনিশিয়রা ছিল সেমিটিক, স্কেথিয়ানরা ছিল পারসীদের জাতিভুক্ত। অপরদিকে সুমারিয়ানরা কোন গোত্র পার্থক্য মানতো না। জিয়া গোকল্‌প মিশরীয়দের কথা উল্লেখ করতেও ভুলে গেছেন। তিনি কি তাদেরকেও তুর্কী মনে করতেন ?

জিয়া গোকল্‌প দাবী করেছেন যে, রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করে তুর্কীরা ইউরোপের ইতিহাসে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। সকল বিপ্লবী তুর্কী জাতীয়তাবাদীর মত তিনিও আধুনিক তুর্কীদের হুন বলে আখ্যায়িত

করেছেন। ফলে বহু তুর্কী অভিভাবক তাদের সন্তানদের নাম রেখেছেন 'Attila'। ধ্বংসাত্মক তৎপরতা সত্ত্বেও রোমের পতনে হুনদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল না। হুন এবং আধুনিক তুর্কীদের সম্বন্ধ অস্পষ্ট। অন্ততঃ আমি যদি তুর্কী হতেম তাহলে তাদের বংশধর বলার মধ্যে কোন গৌরব বোধ করতাম না।

জিয়া গোকল্‌প একটি স্বাধীন সভ্যতার অধিকারী হিসেবে ইসলামকে স্বীকার করে নেননি। যখন একটি জাতি বিবর্তনের সর্বোচ্চ শিখরে পৌছায় তখন তার সভ্যতারও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তুর্কীরা যখন মধ্য এশিয়ার যাযাবর উপজাতি ছিল তখন তারা দূর প্রাচ্যের সভ্যতার অধিকারী ছিল। যখন তারা সুলতানাতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অতিক্রম করেছে তখন বাইজেনটাইন সভ্যতায় প্রবেশ করে এবং ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রবেশের মুখে তারা পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ (IBID ২৭০-১)।

পশ্চিমা সভ্যতা চালুর ব্যাপারে জিয়া গোকল্‌প তার সমসাময়িকদের মত ভাল মন্দ পার্থক্য করেননি। বরং সব ব্যাপারে অনুকরণের ওপর জোর দিয়েছেন– তানজিমাত* এর নেতাদের সব চাইতে বড় ভুল হচ্ছে তারা পূর্ব পশ্চিমের মিশ্রণে মানসিক জগাখিচুড়ী সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, সম্পূর্ণ বিপরীত নীতির দু'টি সভ্যতার আপোষ সম্ভব নয়। দু'ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন, দু'ধরনের বিচার ব্যবস্থা, দু'ধরনের স্কুল, দু'ধরনের কর ব্যবস্থা, দু'টি বাজেট, দু'ধরনের আইন সবই এই ভুলের ফলশ্রুতি। পূর্ব পশ্চিমের আপোষের যে কোন প্রচেষ্টা মধ্য যুগকে আধুনিক যুগে টেনে আনা এবং জিইয়ে রাখার প্রচেষ্টার নামান্তর।

আধুনিক সমর পদ্ধতির সঙ্গে জেনিসারির (Janissary) আপোষ যেমন সম্ভব নয়; আধুনিক ঔষধের সঙ্গে প্রাচীন প্রক্রিয়ার ঔষধকে সারিভুক্ত করা যেমন নিরর্থক, একইভাবে প্রাচীন আইন ও নতুন আইন এবং চিরাচরিত ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে পাশাপাশি ধরে রাখার প্রচেষ্টাও অবান্তর। প্রত্যেক সভ্যতার নিজস্ব যুক্তি, রুচিবোধ এবং বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এই কারণে বিভিন্ন সভ্যতা অবাধে মিশে যেতে পারে না। আবার একই কারণে

* 'তানজিমাত আন্দোলন' উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তুরস্কে পশ্চিমীকরণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা।

যখন কোন সমাজ বিশেষ সভ্যতাকে পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করে না সে সমাজ তার অংশ গ্রহণেও ব্যর্থ হয়। এমনকি যদি কিছু অংশ নিয়েও থাকে তবে তা হজম করতে ব্যর্থ হয়। আমাদের তানজিমাত সংস্কারকরা এদিকটা বুঝতে ব্যর্থ হয়ে সব সময় প্রত্যেক ব্যাপারে অর্ধ পদক্ষেপ নিয়েছেন। জাতীয় উৎপাদন প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণের আগে তারা ভোগ, পরিধান, খাওয়া, নির্মাণ এবং আসবাবের পরিবর্তন করতে চেয়েছেন।

অপরদিকে, এমনকি ইউরোপীয় মানে একটি শিল্পোন্নতির কেন্দ্রও তৈরী হয়নি কারণ তানজিমাতের নীতি নির্ধারকরা অবস্থা পর্যালোচনা না করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা না নিয়েই সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছেন। (IBID পৃঃ ২৭০-৭৭)। জিয়া গোকল্প ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রথম প্রবক্তাদের অন্যতম। পরে মোস্তফা কামাল তা বাস্তবায়ন করেন– আইনে তুর্কীবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হচ্ছে তুরস্কে আধুনিক আইন চালু করা। আধুনিক জাতিসমূহের পর্যায়ে পৌঁছার জন্যে আমাদের মৌলিক শর্ত হচ্ছে ধর্মতত্ত্ব ও যাজক সম্বন্ধীয় সকল শাখা থেকে আইন কাঠামো মুছে ফেলা।

এই দু'টি চরিত্র বহির্ভূত মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রকে আধুনিক রাষ্ট্র বলা হয়। প্রথমতঃ আধুনিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন এবং শাসনের ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে। কোন কার্যালয়, কোন ঐতিহ্য এবং কোন দাবী এই অধিকার খর্ব করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক জাতির সকল সদস্য ধর্ম পরিচয় নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে সমান বিবেচিত হয়। সংক্ষেপে আমাদের আইনের স্বাধীনতা, সাম্য এবং ন্যায় বিচারের বিরোধী সকল ধারা ধর্মতত্ত্ব ও যাজক বিধানের সকল ধারা নির্মূল করতে হবে। তুর্কীবাদ একটি ধর্ম নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং কেবলমাত্র ধর্ম নিরপেক্ষ প্রকৃতির যে কোন আন্দোলনের সঙ্গে আপোষ করতে পারে। (IBID পৃঃ ৩০৪-৫)

ইসলাম ও পশ্চিমীবাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই একথা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন– কেবলমাত্র সভ্যতার দ্বারা ইউরোপ মুসলিম দেশসমূহকে পরাস্ত করতে এবং বিশ্বের প্রভু হতে পেরেছে। তবে কেন এই সফলতার সাক্ষ্যবহ সভ্যতাকে আমরা গ্রহণ করতে পারব না? আমাদের ঈমান কি সকল প্রকারের বিজ্ঞান ও শিক্ষাকে গ্রহণের দায়িত্ব বর্তায় না? আমাদের মহানবী বলেছেন– "জ্ঞান অর্জনের জন্যে প্রয়োজনে চীনেও যাও"

এবং “জ্ঞান ঈমানাদারদের হারানো সম্পদ যেখানেই সে পাবে তা গ্রহণ করা উচিৎ।” জাপানকে ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় কিন্তু সত্যিকার অর্থে ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ না করায় তাদেরকে এশীয় জাতি ধরা হয়।

জাতীয়তাবাদ প্রচার করেই জিয়া গোকল্প সন্তুষ্ট হননি তিনি ইসলামেরও পরিবর্তন চেয়েছেন। কোন জাতীয়তাবাদী তার মত জাতীয়তায় এত উন্মত্ত ছিলেন না। তিনি সকল আরবী ফারসী উদ্ভূত শব্দকে তুর্কীকরণের ওপর জোর দেন। এই পরিশুদ্ধির ফলে এক শতক আগের লিখিত ও পঠিত তুর্কী ভাষা তুর্কীদের কাছে অপরিচিত হয়ে পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে মূল্যবান তুর্কী পাণ্ডুলিপির সকল লাইব্রেরী ইস্তাম্বুল এবং অন্যান্য তুর্কী শহরের যাদুঘরে পঁচতে থাকে। কারণ জাতির বয়োবৃদ্ধরা পর্যন্ত এসব পড়তে বা বুঝতে পারে না। এইভাবে ভাষা সংস্কার চিরস্থায়ীভাবে ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক প্রাচীন তুর্কীর সঙ্গে আধুনিক তুরস্কের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। জিয়া গোকল্প এবং তার অনুসারীরা চেয়েছিলেন– প্রার্থনার ভাষা তুর্কী হতে হবে। যাতে প্রার্থনাকারী তাদের ধর্মের মর্মার্থ বুঝতে পারে, কোরআন তুর্কী ভাষায় পড়তে হবে যাতে ছোট বড় প্রতিটি মানুষ খোদার আদেশ বুঝতে পারে– এমন দেশই হবে তুর্কীদের প্রকৃত স্বদেশ।

জিয়া গোকল্প নিজেকে বড় কবি কল্পনা করতেন। তার ‘ধর্ম ও বিজ্ঞান’ কবিতার একটি অংশের ভাবার্থ নিম্নে দেয়া হলো। এতে তিনি আদর্শ নারীত্বের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে– নারী সে আমার মা ভগিনি বা কন্যা হোক, তার মধ্যে আমার জীবনের গভীর আবেগ নিহিত। চন্দ্র, সূর্য বা তারকার প্রতি আমার ভালবাসা সেও নারীর কারণে। নারীই আমাদের জীবনের ছন্দময় সত্তাকে বুঝতে সাহায্য করে। কিভাবে খোদার পবিত্র আইন এই সুন্দর জীবকে ঘৃণ্য বিবেচনা করতে পারে? নিশ্চয়ই বিজ্ঞরা কোরআনের ব্যাখ্যায় ভুল করেছেন। জাতি এবং রাষ্ট্রের ভিত হচ্ছে পরিবার, যতদিন নারীর প্রকৃত মর্যাদা দেয়া না হবে ততদিন জাতীয় জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পরিবারের লালন পালনে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অতএব তিনটি বিষয়ে সাম্য প্রয়োজন– তালাক, পৃথক হওয়া এবং উত্তরাধিকারে। যতদিন উত্তরাধিকার এবং বিবাহের ব্যাপারে নারীকে

পুরুষের অর্ধেক বিবেচনা করা হবে ততদিন পরিবার বা দেশ উন্নতি করতে পারবে না। অন্যান্য অধিকারের জন্য আমরা জাতীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। কিন্তু পরিবারকে আমরা কাজী এবং ধর্মতাত্বিকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। আমি জানিনা কেন আমরা নারীকে অসহায়ত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছি। সে কি জাতির জন্যে কাজ করে না? অথবা সে কি তার সূঁচকে তীক্ষ্ম বেয়নেটে রূপান্তরিত করে বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে অধিকার ছিনিয়ে নেবে? (IBID পৃঃ ১৬১)

ডঃ মোহাম্মদ ইকবাল তার 'ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন' গ্রন্থে লিখেছেন- জিয়া গোকল্পের ইজতিহাদ প্রায়ই আপত্তিকর। (পৃঃ ১৬০) তুর্কী কবির দাবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি খুবই আশঙ্কিত যে তিনি ইসলামের পারিবারিক আইন সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতেন না। (পৃঃ ১৬৯)

জিয়া গোকল্পের স্বাদ ছিল ইসলামকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধর্মে সংস্কার করা। ধর্মের আধুনিকীকরণ ও বিজ্ঞানিকরণ দ্বারা তিনি মসজিদকে খৃষ্টীয় গীর্জার মত বানাতে চেয়েছিলেন। তার মৃত্যুর বার বছর পর ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটি অফ ডিভাইনিটি বা ঐশ্বরিক অনুষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ পাঠানোর জন্যে একটি কমিটি নিয়োগ করলে তার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়। ১৯২৮ সালের জুনে প্রকাশিত কমিটির রিপোর্টে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রার্থনাকে 'সুন্দর' 'উৎসাহব্যঞ্জক' এবং 'আধ্যাত্মিক' করার জন্যে মসজিদে বসার আসন, ক্লোকরুম চালু, জুতা নিয়ে নামাজ আদায়, প্রার্থনার ভাষা হিসেবে তুর্কী ভাষা চালু, আরবী বিলোপ, প্রার্থনায় সেজদার নিয়ম বাতিল, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাদ্যযন্ত্রী এবং বাদ্য যন্ত্র রাখার সুপারিশ করা হয়। পশ্চিমী আধুনিক যন্ত্র সঙ্গীত মসজিদে চালুর জন্যে বিষয়টি খুবই জরুরী।*

তুর্কী মুসলমানরা দুনিয়ার অন্যান্য মুসলমানের মত ধর্মনিষ্ঠ হওয়ায় জিয়া গোকলপের হাতে ইসলামের এই অঙ্গহানি মেনে নিতে অস্বীকার করেন। দারুন ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে অতঃপর এই প্রকল্প প্রত্যাহৃত হয়।

* The Emergence of Modern Turkey. Bernerd Lewis p-408.

মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক : জীবন ও কাজের মূল্যায়ন

মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক ১৮৮১ সালে সালোনিকার এক জীর্ণ কুটিরে জন্মগ্রহণ করেন। সরকারী অফিসের ছাপোষা কেরানীর পদে ইস্তফা দেয়ার পর তার বাবা আলী রেজা ব্যবসায়ে দু'বার ব্যর্থ হন। পরে দুঃখকষ্ট ভুলে থাকার জন্যে মাদকদ্রব্যে ডুবে থাকেন এবং আতাতুর্কের ৭ বছর বয়সের সময় যক্ষারোগে মারা যান। তার মা জুবাইদা খুবই পর্দানশীল এবং অশিক্ষিতা ছিলেন। পরিবারের কর্তৃত্ব তার হাতেই ছিল। তার স্বামীর বৈপরিত্যে তিনি ছিলেন খুবই ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। সে যুগের অন্যান্য তুর্কী মহিলার মত তার সমগ্র জীবন বড় ছেলেকে ঘিরেই কেন্দ্রীভূত ছিল। গভীর ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে জুবাইদা চেয়েছিলেন তার সন্তান ধার্মিক পণ্ডিত হবে।

কিন্তু সন্তানের ভিন্ন ধ্যান ছিল, তিনি সকল প্রকার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং প্রকাশ্যে তার শিক্ষকদের অপমান এবং গালাগালি করতেন। তার সহপাঠিদের প্রতিও তার ব্যবহার ছিল অমার্জিত এবং তাদের খেলা ধুলায় অংশগ্রহণ না করে সকলের অপ্রিয় হয়ে উঠেন। তার কাজে হস্তক্ষেপ করলে তিনি বিরক্ত হয়ে একলা খেলাধুলা করতেন। এ ধরনের উদ্ধত আচরণে একদা এক শিক্ষক ক্রোধান্ধ হয়ে তাকে বেদম প্রহার করেন। মোস্তফা স্কুল থেকে পালিয়ে যান এবং পুনরায় স্কুলে যেতে অস্বীকার করেন। তার ধর্মনিষ্ঠা মা বুঝাতে চেষ্টা করলে তিনি তাঁকে উল্টো আঘাত করেন। জুবাইদা হতাশ হয়ে কি করবেন ভেবে উঠতে পারলেন না, পরে তার এক চাচা তাকে সালোনিকার সামরিক স্কুলে পাঠিয়ে সৈনিক করার পরামর্শ দেন।

সরকারের অনুদানে পরিচালিত হওয়ায় স্কুলে তার কোন খরচ পড়বে না, যোগ্যতার পরিচয় দিলে সে অফিসার হবে যদি তা না হয় অন্ততঃ সাধারণ সৈনিক হবে। যে কোনভাবে তার ভবিষ্যৎ জীবন যাত্রার নিশ্চয়তা আছে। যদিও জুবাইদা রাজী হননি কিন্তু তার বাধ সাধার আগেই মোস্তফার বাবার

জনৈক বন্ধু তাকে কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যেতে সম্মত হন। সে পরীক্ষা দেয় এবং ক্যাডেটে উত্তীর্ণ হয়। এখানেই সে নিজের জীবন শুরু করল। শিক্ষাগত দিক থেকে সে এতই সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে যে, তার একজন শিক্ষক তাকে মোস্তফা নাম দেন। এই আরবী শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ। অঙ্ক এবং সামরিক বিষয়ে মেধার কারণে তাকে শিক্ষকতায় নিযুক্ত করা হয়।

শেষ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ পদমর্যাদাসহ ১৯০৫ সালের জানুয়ারীতে তিনি ক্যাপ্টেন পদমর্যাদায় স্নাতক সম্মান পাশ করেন। এই সময় তিনি VATAN বা স্বদেশ নামে পরিচিত জাতীয়তাবাদী ছাত্র সমিতিতে যোগ দেন। VATAN এর সদস্যরা বিপ্লবী হওয়ার জন্যে গর্বিত ছিলেন। তারা সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের শাসনের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং ইসলামের কর্তৃত্ব অবমাননাকারী তথাকথিত উদার নীতির প্রতি কঠোরতার জন্যে তার নিন্দে করেন।

তারা তুরস্কের অনগ্রসরতার জন্যে ইসলামকে দায়ী করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না এবং শরিয়তকে সেকেলে বলে আখ্যায়িত করেন। 'ভাতানে'র সদস্যরা সুলতানকে অপসারনের শপথ নেন এবং তার পরিবর্তে পশ্চিমী চালের সরকার, সংবিধান, পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন, তারা উলেমা বা ধর্মীয় পণ্ডিতদের কর্তৃত্ব অস্বীকার, পর্দা বিলোপ এবং নারী পুরুষের নিরঙ্কুশ সাম্যের প্রচেষ্টা শুরু করেন। শীগগীরই মোস্তফা কামাল এর প্রধান হয়ে যান।

১৯০৮ সালে সুলতান আবুদল হামিদকে অপসারণের আগে তরুন তুর্কীদের ক্ষমতাসীন সংগঠন The committee of union and progress মোস্তফা কামালকে দলে যোগদানের আহ্বান জানালে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ এসে যায়। অবশ্য দলের নতুন সদস্য হিসেবে তাকে আদেশ মানতে হত, এ সময় তার প্রকৃতি ছিল হয় তাকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে হবে নতুবা কোন অংশগ্রহণ করতে হবে না, তিনি ক্রমেই চরম এবং অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। দলের অন্যান্য সদস্যকে তিনি কোন গুরুত্বই দিতেন না। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী যুবরাজ সৈয়দ হালিম পাশা এবং সমরমন্ত্রী আনোয়ার পাশাকে ঘৃণা করতেন। তিনি তাদের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া করতেন।

পরবর্তী দশ বছর সামরিক পেশায় নিজেকে জন্মগতভাবে সৈনিক এবং নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত হন। ক্রমান্বয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তিনি আরও রাজনৈতিক প্রভাবের অধিকারী হন। সন্ধ্যায় তালাবদ্ধ ঘরে তিনি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় গোপনে বৈঠক করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব রক্ষায় নেতৃত্ব দেয়ায় তার সুযোগ সৃষ্টি হয়। দেশ রক্ষার জন্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সৈনিকদের প্রিয় নেতা মোস্তফা কামাল পাশা জাতীয় বীরে পরিণত হন। গ্রীকের পরাজয় এবং তুরস্কের বিজয় সুনিশ্চিত হওয়ায় তুর্কী জনগণ আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যান। তারা তাকে রক্ষক হিসেবে অভিনন্দিত করেন এবং গাজী উপাধিতে ভূষিত করেন।

কূটনীতিক আবেগের আতিশয্যে প্রাচ্যের দেশগুলো তাকে পাশ্চাতের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের নেতা হওয়ার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রীয় পরিষদে আরব রাষ্ট্রনায়কদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন : আমি সকল ইসলামী রাষ্ট্রের ফেডারেশন বা সোভিয়েতের অধীনে সকল তুর্কী জনগণের লীগ কোনটাতেই বিশ্বাসী নই, আমার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে তুরস্কের প্রাকৃতিক সীমান্তে তার স্বাধীনতা রক্ষা করা, উসমানীয় বা অন্য কোন সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবনের জন্যে নয়, স্বপ্নের মোহ দিয়ে অতীতে তারা আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে।

তার সমর্থন আদায়ের জন্যে আগত কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে আরও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন : এখানে কোন শোষক বা শোষিত নেই। এখানে কেবল তারা আছে যারা নিজেদের শোষণ করার অনুমতি দেয়। তুর্কীরা এদের মধ্যে নেই, তারা কেবল নিজেদের ব্যাপারে সচেতন। অন্যরাও তাই করুক, আমাদের একটা মাত্র নীতি– তুর্কীর চোখে সকল সমস্যাকে দেখা এবং তুর্কীর জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা।

স্বাভাবিক সীমান্তের মধ্যে ক্ষুদ্র এবং সংহত জাতি, সবকিছুর উর্ধ্বে একটি সমৃদ্ধশালী আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে তুরস্ককে গড়ে তোলার ব্যাপারে মোস্তফা কামাল পাশার ঘোষিত নীতি বিশ্বের সকল জাতি কর্তৃক সম্মানিত হয়েছে। তিনি এতই দৃঢ় আস্থাবান ছিলেন যে, এই কাজ সমাধার জন্যে তিনি

যোগ্যতম ব্যক্তি। তিনি দাবী করেন আমি তুরস্ক, আমাকে ধ্বংস করার মানে তুরস্ককে ধ্বংস করা।

ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি তুর্কী জাতির জীবন থেকে ইসলামের সকল চিহ্ন মুছে ফেলবেন। কেবলমাত্র ইসলামের কর্তৃত্ব নির্মূল করার পরই তুর্কীরা অগ্রগতি করতে পারে এবং আধুনিক ও সম্মানিত জাতিতে পরিণত হতে পারে। তিনি ইসলাম এবং ইসলামের সকল দিকের বিরুদ্ধে জনসমক্ষে একের পর এক বক্তৃতা দিতে থাকেন।

প্রায় পাঁচশ বছর ধরে একজন আরব শেখের মতবাদ ও আইন এবং অলস ও অকর্মন্য মোল্লাদের ব্যাখ্যা তুরস্কের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করে আসছে। তারা সংবিধানের ধরন, প্রতিটি তুর্কীর জীবনযাত্রা, তার খাদ্য, তার নিদ্রা এবং শয্যা ত্যাগের সময়, তার কাপড়ের আকৃতি, তার সন্তান ধারক ধাত্রীর রুটিন, তার স্কুলের পঠিতব্য বিষয়, তার আচার প্রথা, চিন্তা এমনকি তার ঘনিষ্ঠ অভ্যাস নির্ধারণ করে আসছে। ইসলাম একজন ধর্মতাত্ত্বিক নীতিহীন আরবের প্রচলিত একটি মৃত বস্তু। সম্ভবতঃ এটি মরুর উপজাতিদের জন্য উপযুক্ত ছিল। বর্তমান আধুনিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রের জন্যে এর কোন মূল্য নেই। খোদার ওহি ? কোন খোদাই নেই! এগুলো হচ্ছে শৃংখল, যার দ্বারা মোল্লা এবং খারাপ শাসকরা জনগণকে নত থাকতে বাধ্য করে, যে শাসক ধর্ম চায় সে দুর্বল প্রাণী, কোন দুর্বল প্রাণীর শাসন করা উচিত নয়। (IBID পৃঃ ১৯৯-২০০)

আবদুল মজিদ খলিফা নির্বাচিত হলে মোস্তফা কামাল পাশা চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার অনুমতি দেননি। বিষয়টি আলোচনার জন্যে পরিষদের বৈঠক বসার পর মোস্তফা কামাল বিতর্ক বন্ধ করে দিয়ে বলেন : নামমাত্র রাষ্ট্র প্রধান ছাড়া খলিফার কোন ক্ষমতা বা মর্যাদা নেই। আবদুল মজিদ তার ভাতা বৃদ্ধির দাবী জানিয়ে দরখাস্ত করলে মোস্তফা কামাল উত্তর দেন– আপনার খেলাফতের অফিস ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর অস্তিত্বের কোন যৌক্তিকতা নেই। আমার কোন সচিবের কাছে লিখা আপনার ধৃষ্টতার সামিল।

১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ খেলাফতকে চিরদিনের জন্যে সম্পূর্ণ বিতাড়িত এবং সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ তুর্কী জাতি প্রতিষ্ঠার জন্যে পরিষদে বিল উত্থাপন করেন। বিল পেশ করার আগে এবং বিল সম্পর্কে কেউ কিছু জানার আগে দূরদর্শিতার সঙ্গে তার কোন কাজের বিরোধিতাকে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেন–

"সবকিছুর বিনিময়ে প্রজাতন্ত্র বজায় রাখতে হবে। উসমানীয় সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পরও ধর্মীয় আইনের ওপর ভিত্তিকৃত নড়বড়ে কাঠামো ছিল। খলিফা এবং উসমানীয় পরিষদের অবশেষকে বিদায় করতে হবে। প্রাচীন ধর্মীয় আদালত এবং আইনের যায়গায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক দেওয়ানী আইন চালু করতে হবে। মোল্লাদের মক্তবে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে পৃথক করতে হবে। তুর্কী প্রজাতন্ত্রকে সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে।"

পরবর্তী পর্যায়ে কোন বিতর্ক ছাড়াই বিলটি গৃহীত হয় এবং সাবেক খলিফা ও তাঁর পরিবারকে সুইজারল্যাণ্ডে নির্বাসনে পাঠানো হয়। নতুন প্রশাসন তখন এই আইন জারী করেন। নতুন তুর্কী সংবিধানের মুখবন্ধ আতাতুর্কের সংস্কারের প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ করছে এবং ১৫৩ অনুচ্ছেদ সংস্কার থেকে পশ্চাতে ফিরে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে। এই সংবিধানের কোন ধারাকে ভাষান্তর বা সংবিধান বিরোধী বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না, কারণ নিম্ন বর্ণিত সংস্কার আইনগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে তুর্কী সমাজকে সমসাময়িক সভ্যতার পর্যায়ে পৌঁছানো এবং প্রজাতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যা গণভোটে গৃহীত হওয়ার দিন থেকে কার্যকর হয়েছে–

১। ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চের শিক্ষা ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে একত্রীকরণের আইন।

২। ১৯২৫ সালের পঁচিশে নভেম্বরের টুপি আইন।

৩। দরবেশ আশ্রম, সমাধি স্তম্ভসমূহ বন্ধ এবং সমাধি রক্ষকের কার্যালয় বিলুপ্তি এবং ১৯২৫ সালের ৩০শে নভেম্বরের কতিপয় খেতাব নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আইন।

৪। ১৯২৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সাধারণ বিয়ের নিয়ম কানুন।

৫। ১৯২৮ সালের ২০শে মে'র আন্তর্জাতিক সংখ্যা প্রবর্তন সংক্রান্ত আইন।

৬। ১৯২৮ সালের ১লা নভেম্বরের তুর্কী হরফের যায়গায় ল্যাটিন হরফ চালু ও প্রয়োগ এবং আরবী পাণ্ডুলিপি নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আইন।

৭। ১৯৩৪ সালের ২৬শে নভেম্বরের পাশা, BEY ও EFFENDI ধরনের খেতাব ও পরিচিতি বাতিল সংক্রান্ত আইন।

৮। ১৯৩৪ সালের ৩রা ডিসেম্বরের দেশী পোষাক পরিধান নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আইন।

আতাতুর্কবাদকে পুরোপুরি অস্বীকার করা অসম্ভব এবং অচিন্তনীয় হয়ে পড়লো। এটা অসম্ভব কারণ সংবিধান তা নিষিদ্ধ করেছে, অচিন্তনীয় কারণ বৃদ্ধ এবং যুবারা সংস্কারের ফলাফল গ্রহণ করেছে এবং সমৃদ্ধ জীবনের জন্যে পশ্চিমীকরণ একটা জনপ্রিয় ম্যাজিক হয়ে উঠেছে[১]।

যে সময় এসব সংস্কার কার্যকর করা হচ্ছিল মোস্তফা কামাল পাশা লতিফা নাম্নী ইউরোপীয় শিক্ষিতা একজন সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করেন। তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মোস্তফা কামাল পাশা এই মহিলাকে পুরুষদের পোষাক পরিধান এবং মহিলাদের নিরঙ্কুশ সাম্যের দাবী করতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু আত্মসম্মান বোধ সম্পন্না হয়ে যখন তিনি সম্মানিত স্ত্রীর মত ব্যবহারের দাবী করেন, রাগান্বিত হয়ে মোস্তফা তাকে তালাক দেন। লতিফাকে তালাক দেয়ার পর তাঁর লজ্জাহীনতার সীমা ছিল না। এত বেশী মদ পান শুরু করেন যে, তিনি মদ্যপ বনে যান। সুন্দর যুবক ছেলেরাই তাঁর কামপ্রবৃত্তির লক্ষ্য হয়ে পড়ে এবং তাঁর রাজনৈতিক সমর্থকদের স্ত্রী কন্যাদের প্রতি তার ব্যবহার এতই উদ্ধত হয়ে পড়ে যে, তারা তাদের মহিলাদেরকে তাঁর কাছ থেকে যতদূরে সম্ভব পাঠাতে শুরু করলেন। যৌনরোগে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে।

তাঁর চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে The grey wolf এর লেখক H. G. Armstrong- লিখেন– মোস্তফা কামাল পাশা সব সময় একা, নিঃসঙ্গ ও

1. Turkey to-day and to-morrow: An experiment in westernization, Nuri Eren Praeger, New york, 1963 P-100-102.

একক হাতে খেলছিলেন। তিনি কাউকে বিশ্বাস করেননি। তাঁর নিজের মতের বিরোধী কোন মতের প্রতি তিনি কর্ণপাত করতেন না। কেউ তাঁর সঙ্গে মতদ্বৈততা দেখালে তিনি তাকে অপমান করতেন। তিনি সব কাজ আত্ম স্বার্থের মাপকাঠিতে বিবেচনা করতেন। তিনি বিবেচনাহীন প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন। একজন চতুর বা সক্ষম মানুষ তার কাছ থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন ছিল। অন্য যে কোন লোকের পারদর্শিতা সম্পর্কে তিনি খুবই খুঁতখুঁতে ছিলেন। তিনি তাঁর সমর্থকদের চরিত্র হনন এবং তাদের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে পাশবিক আনন্দ পেতেন। অবজ্ঞা ছাড়া তিনি কখনো দয়া বা উদারতা দেখাননি। তিনি কারো ওপর আস্থা স্থাপন করেননি। তার কোন ঘনিষ্ঠ লোকও ছিল না। তার বন্ধুরা শয়তান গোছের, যারা তার সঙ্গে মদ্যপান করতো, তার ইন্দ্রিয় সুখে সহায়তা করতো। যুদ্ধের কালো দিনগুলোতে যেসব ভাল লোক তার পাশে ছিলেন পরবর্তী কালে সকলেই তার বিরুদ্ধে ছিলেন। (পৃঃ ২১৩-১৪)

কোন স্বৈরাচারী প্রতিদ্বন্দ্বী বরদাশ্‌ত করতে পারে না। কামাল পাশাও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিশ্চিহ্ন করতে কোন সুযোগই ছাড়েননি– গোপন পুলিশ তাদের কাজ করেছে। গ্রেফতারকৃত রাজনৈতিক নেতাদেরকে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়ার জন্যে পুলিশ খেয়াল খুশী মত অত্যাচার করেছে। তাদের বিচারের জন্যে একটি স্বেচ্ছাচারী ট্রাইবুনাল মনোনয়ন করা হয়েছে। কোন বিচার পদ্ধতি বা সাক্ষ্য ছাড়াই আদালত তাদের ফাঁসীর আদেশ দিয়েছেন।

মৃত্যু পরোয়ানায় মোস্তফা কামালের স্বাক্ষরের জন্যে তার খানকায়ার প্রাসাদে পাঠানো হয়। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্তদের একজনের নাম ছিল আরিফ। মোস্তফা কামালের সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি বিরোধী দলে যোগ দেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভৎস দিনগুলোতে আরিফ তার পাশাপাশি ছিলেন। আরিফ তার এতই ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে তার কাছে পাশা হৃদয়ের সমস্ত কথা খুলে বলতেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন বলেছেন মৃত্যু পরোয়ানা প্রাপ্তির পর গাজীর মুখে সামান্য পরিবর্তনও হয়নি, তিনি কোন মন্তব্য করেননি এবং স্বাক্ষরদানে কুণ্ঠা করেননি। তিনি ধুমপান করছিলেন। এ্যাশট্রেতে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ রেখে তিনি নির্বিকার চিত্তে আরিফের মৃত্যু পরোয়ানার স্বাক্ষর করে পরবর্তী কাজে মনোনিবেশ করলেন।

তিনি সব কাজ যথাযথভাবে করেন। সে রাতেও তিনি 'খানকায়ায়' পার্টির আয়োজন করলেন। বিচারক, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এবং সকল সুন্দরী মহিলাকে আসতে হবে। আঙ্কারায় উৎসব চলতেই হবে।

খুব শান্তভাবে নাচ শুরু হয়। লণ্ডন থেকে তৈরী নিষ্কলঙ্ক পোষাক পরে গাজী এক কোণায় কূটনীতিকদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। অতিথিরা খুব সকর্ততার সঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য করছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি খোশ মেজাজ দেখাবেন ততক্ষণ সবাইকে সতর্কতার সঙ্গে নীচ স্বরে কথাবার্তা বলতে হয়। তার ক্রোধের সময় কারও আনন্দ প্রকাশ খুবই বিপদজনক। কিন্তু গাজী খুবই খোশ মেজাজে ছিলেন। এটা কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ছিল না। কেবলমাত্র স্ফূর্তি করে রাত কাটানোর অনুষ্ঠান। তিনি বললেন– "আমাদেরকে উৎফুল্ল হতে হবে। আমাদেরকে বাঁচতে হবে। সজাগ হোন!" একথা বলেই তিনি এক অপরিচিতা মহিলার হাত ধরে নাচ গান শুরু করলেন। অতিথিদের একে একে সবাই তার অনুসরণ করলেন। তারা নাচলেন। যদি না নেচে থাকেন গাজী তাদের নাচালেন। গাজী উত্তেজিত হয়ে তার সঙ্গীর পাশাপাশি ঘুরতে লাগলেন এবং সবাইকে নাচের ফাঁকে ফাঁকে পানীয় দিতে লাগলেন।

আঙ্কারা থেকে চার মাল দূরে। ডজন খানেক বৈদ্যুতিক বাতিতে সমুজ্জ্বল একটি বিরাট মোড়। এর চারিদিকে এবং রাস্তায় বিরাট জনতা সমবেত। বৈদ্যুতিক বাতির নীচে কারাগারের পাথরের দেয়াল ঘেঁষে বিরাটকায় ৮টি কাঠের ত্রিভুজ। প্রতিটির নীচে একজন মানুষ। তার হাত পেছনে টেনে বাঁধা এবং গলার ফাঁস জড়ানো। মোস্তফা কামাল পাশার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা মৃত্যুর মুখোমুখি।

বিরাট নীরবতার মধ্যে প্রত্যেকেই পর পর জনতার উদ্দেশ্যে কিছু বললেন। একজন একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, আরেকজন প্রার্থনা করলেন, তখনও একজন চীৎকার করে বললেন– তিনি তুরস্কের অনুগত সন্তান।

'খানকায়া'র প্রায় সকল অতিথিই চলে গেছেন। কক্ষগুলো সিগারেটের গোড়া, মদমিশ্রিত থুথু, মাদকীয় গন্ধে ভুর ভুর করছিলো। মেঝে, টেবিল সব জায়গায়ই তাস আর টাকা গড়াগড়ি দিচ্ছিল।

মোস্তফা কামাল কক্ষের ভেতর দিয়ে হেটে গিয়ে একটি জানালার পাশে দাঁড়ালেন। তার মুখমণ্ডল স্থির এবং ধূসর; ফ্যাকাশে দৃষ্টি অভিব্যক্তিহীন, তার দেহে ক্লান্তির কোন ছাপ নেই, তার বৈকালিক পোশাক আগের মতই নিষ্কলঙ্ক। পুলিশের কমিশনার জানালেন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। সমস্ত লাশ ফেলে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তার শত্রুরা হয় নিশ্চিহ্ন, নতুবা মৃত অথবা ছিন্নবিচ্ছিন্ন। (পৃঃ ২২৯-২৩৬)

এদিকে তুর্কী জনগণের ধুমায়িত বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে লাগল। ১৯২৬ সালে পার্বত্যাঞ্চলের কুর্দী উপজাতিরা কামাল প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করলে ধুমায়িত বিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। মোস্তফা কামাল ব্যবস্থা গ্রহণে কালবিলম্ব করেননি। তুর্কী কুর্দীস্থানে বর্বর অত্যাচার শুরু করলেন, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিলেন, পশু ও শষ্য ধ্বংস করলেন, মহিলা ও শিশুদের ধর্ষণ এবং হত্যা করলেন। ৪৬ জন কুর্দী নেতাকে জনসমক্ষে ফাঁসী দিলেন। সবশেষে মরলেন কুর্দী নেতা শেখ সাঈদ। তিনি হত্যাকারীর উদ্দেশ্যে বললেন– "তোমার প্রতি আমার কোন ঘৃণা নেই। তুমি এবং তোমার মনিব কামাল আল্লাহর নিকট ঘৃণিত। শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর কাছে আমাদের ফয়সালা হবে।"

মোস্তফা কামাল এখন নিরঙ্কুশ একনায়ক। তুর্কী জনগণ টুপি এবং পাগড়ী নিষিদ্ধকরণ, পশ্চিমা পোষাক বাধ্যতামূলক পরিধান, ল্যাটিন হরফ, খ্রীষ্টীয় বর্ষপঞ্জিকা, রবিবার সরকারী ছুটির দিন প্রভৃতি ইসলাম বিরোধী সংস্কারকে অস্ত্রের মুখে মেনে নিলেন। হাজার হাজার উলামা এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলরা সত্যের জন্যে প্রাণ দিলেন, তুর্কী জনগণ এসব চেয়েছে এটা বলা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। আরও বিলম্বের আগেই তুরস্কের বাইরের এবং ভেতরের মুসলমানদেরকে নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপগুলো অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে–

১. তুর্কী মুজাদ্দিদ বদিউজ্জামান সৈয়দ নূরসীর আন্দোলনকে পুরো বস্তুগত ও নৈতিক সমর্থন দিতে হবে। যদিও এটি সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে পরিহার করছে তবুও তুরস্কের বুকে এটাই একমাত্র সংগঠন যা নির্ভেজাল ইসলাম প্রচার করছে এবং পশ্চিমীবাদের অনিষ্টকে প্রতিরোধে সক্ষম।

২. যে সব শহর ও গ্রামের জনগণ এখনো ঈমানের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং সংবিধান থেকে ইসলাম বিরোধী ধারা বাতিল করে শরিয়তের প্রাধান্যের জন্যে সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছেন সে সব এলাকায় এই আন্দোলনের সমর্থকদেরকে ইসলাম প্রচারে উৎসাহ দিতে হবে এবং সংঘবদ্ধ করতে হবে।

৩. তুরস্কে শিক্ষার সকল পর্যায়ে আরবী ভাষায় কোরআন ও হাদীস অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদেরকে ফার্সী এবং উর্দু অধ্যয়নে উৎসাহিত করতে হবে এবং এ জন্যে উপযুক্ত পাঠ্যক্রম চালু করতে হবে। এই ব্যবস্থা তুরস্কের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে তাদের অন্যান্য জায়গার মুসলমান ভাইদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তুলবে।

৪. উসমানীয় আমলের তুরস্কের আরবী পাণ্ডুলিপি শিক্ষার সকল স্তরে পড়াতে হবে। এতে তুরস্কের ইসলামী ঐতিহ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে। এতে আমাদের ঐতিহ্যেরও পুনরুদ্ধার হবে যা শুধু তুর্কী নয় অন্য জায়গার মুসলমানদেরও কাজে আসবে।

৫. অসুন্দর অর্ধনগ্ন পোষাক পরিধান করে পশ্চিমা ফ্যাশনে এবং প্রথায় মহিলাদের জনসমক্ষে আসা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। মহিলা বা পুরুষ সকলের জন্যে পশ্চিমা ফ্যাশনের অনুকরণকে নিরুৎসাহিত করতে হবে, ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে ইসলামী নম্রতা ও শিষ্ঠতা শেখাতে হবে এবং সে ধরনের পোষাক পরিধানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৬. তুর্কী জনগণকে বোঝাতে হবে যে, পশ্চিমাদের সঙ্গে গোত্রভুক্ত করা তাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। তাদের জানা উচিৎ তুরস্ক ন্যাটোর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা এবং বৃটেন গ্রীকের আর্কবিশপ ম্যাকারিয়সকে সমর্থন করছে এবং তুর্কী সাইপ্রিয়টদের বাঁচাবার জন্যে কিছুই করছে না। এটাই হচ্ছে তুর্কীদের প্রতি পশ্চিমাদের প্রীতির নমুনা।

শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্

শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্ উনিশ শতকের মিশরে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা তাঁর জীবদ্দশায় ব্যর্থ হলেও তাঁকে খাট করে দেখা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী দশকেই তাঁর প্রভাব অনুভূত হয়। মিশরের অধিকাংশ বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষক, সাহিত্যিক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তার শিষ্য এবং সহযোগী ছিলেন।

শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্ ১৮৪৯ সালে এক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অভিভাবকরা অশিক্ষিত হলেও ধর্মনিষ্ঠ এবং চরিত্রবান ছিলেন। স্থানীয় মক্তবে তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। লিখতে এবং পড়তে শেখার পর তাঁর অভিভাবক তাঁকে কোরআন পড়ার জন্যে স্থানীয় একজন হাফেজের কাছে পাঠান। ১২ বছর বয়সে তিনি পরিপূর্ণ কোরআন শরীফ মুখস্ত করেন। পরবর্তী বছর তাঁর অভিভাবক তাঁকে তান্তার মক্তবে পাঠান কিন্তু তিনি সেখানকার শিক্ষা পদ্ধতিতে বিরক্ত হয়ে উঠেন। স্কুল থেকে উপকৃত হবে না এ কথা বুঝতে পেরে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে যান এবং আর কোন পুস্তক না খোলার অঙ্গীকার করেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন, এ সময় পিতার মত মাটি কাটা ছাড়া তাঁর আর কোন উচ্চাকাঙ্খা ছিল না।

অবশ্য ভাগ্যের বিধান ছিল অন্যরূপ। তাঁর এক চাচা তার প্রতি দৃষ্টি দেন এবং তাঁকে সুফীবাদের সঙ্গে পরিচিত করান। এ সময় সুফীবাদে তিনি এতই মগ্ন হয়ে যান যে, এটাই তাঁর জীবনের প্রধান দিক হয়ে পড়ে। নতুন আশায় উদ্বেলিত হয়ে তিনি তান্তায় ফিরে যান এবং লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি এতই অসাধারণ প্রতিভাধর ছিলেন যে, খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে আল-আজহারে পড়ার জন্যে একটি বৃত্তি লাভ করেন।

শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্ তান্তার মত আল-আজহারের শিক্ষায় হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি এর শিক্ষা পদ্ধতিকে বিরক্তিকর, প্রাণহীন এবং গোঁড়ামিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেন। হতাশ হয়ে তিনি সুফীবাদ ও তপস্যায়

আত্মনিয়োগ করেন। পার্থিব জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ আকর্ষণহীন জীবনের এই অংশে তিনি জামাল উদ্দীন আফগানীর সাক্ষাৎ পান। তাঁর গতিশীল ব্যক্তিত্ব এবং উৎসাহ তাঁকে ইসলামের সাবেক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে অনুপ্রাণিত করে। তবে জামাল উদ্দীন আফগানীর মত রাজনৈতিক বিপ্লবকে উদ্দেশ্যে পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ না করে তিনি মনে করেন শিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব।

১৮৭৭ সালে শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্ আল-আজহার থেকে আলেম খেতাব নিয়ে স্নাতক পাশ করেন। কিন্তু পুনরায় শিক্ষক হিসেবে সেখানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মুসলিম শিক্ষা পুনরায় চালুকেই তাঁর প্রধান কর্তব্যে পরিণত করেন। পশ্চিমা শিক্ষা এবং বিজ্ঞানকে ইউরোপের সম্পদ ও শক্তির মাপকাঠি মনে করে তিনি মিশর ও পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশে তা সম্প্রসারণকে নিজের দায়িত্ব মনে করেন। আল-আজহার মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধি ও শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হওয়ায় তিনি ভাবলেন আল-আজহারের সংস্কার করা হলে ইসলামের সংস্কার হয়ে যাবে। তিনি চিরাচরিত শিক্ষাকে আধুনিক যুগের অনুপযোগী আখ্যায়িত করেন এবং শেখ ও উলামারা আধুনিক যুগের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারায় তাদের নিন্দা করেন।

শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্ ইউরোপ এবং তার সভ্যতার উৎসাহী গুণগ্রাহী ছিলেন। ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স সফর করে তিনি এতই অভিভূত হয়ে যান যে, তিনি বারবার তাঁর আত্মার নবায়নের জন্যে সেখানে ফিরে যান। তিনি বলেন "আমার জনগণের পরিবর্তন সাধনের স্বপ্ন সফল না হওয়া পর্যন্ত আমি কখনো তা নবায়নের জন্যে ইউরোপ যাইনি।" যখনি তিনি মিশরে প্রতিবন্ধকতার কারণে হতাশ হয়েছিলেন তখনি তিনি ইউরোপ গেছেন এবং দুই-তিন মাসের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন আগে যা তার কাছে কঠিন মনে হয়েছে এখন তা খুবই সহজ।

যদিও শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্ ইবনে আরাবীর নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদীদের বিপ্লবী গোলযোগের বিরোধী ছিলেন, তিনি কখনো বৃটিশ সহযোগী KHEDIVE-এর বিরুদ্ধে তাদের পক্ষ নেননি। পরবর্তীকালে আরাবী বিদ্রোহীরা ধ্বংস হয়ে গেলে এবং বৃটেন মিশর দখল করার পর শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্কে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তক্ষুণি তিনি প্যারিস যান এবং জামাল উদ্দীন আফগানীকে AL URWAH AL

WUTHQA লেখা ও প্রকাশে সাহায্য করেন।

অবশেষে ১৮৮৩ সালে খেদাইব তৌফিক পাশা তাঁকে ক্ষমা করে শুধু নির্বাসন শেষ করেননি উপরন্তু তাঁকে স্থানীয় আদালতের কাজী পদে নিয়োগ করেন। তিনি অবশ্য কখনো আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিকীকরণের প্রধান দায়িত্বের কথা ভুলেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সম্মান ও প্রভাব বাড়তেই থাকে। শিক্ষকদের সমর্থন লাভের জন্যে তিনি তাঁদের বেতন বাড়িয়ে দেন, আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি করেন। ছাত্রদের আবাসিক সুবিধাও উন্নত করা হয়, তাদের বিনা খরচায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং পাঠাগারের সংস্কার সাধন করেন। বস্তুগত সংস্কার ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক আধুনিকীকরণের সূচনামাত্র। তিনি আল-আজহারের পাঠ্যক্রমে আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় সংযোজন করে তাকে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে উন্নীত করতে মনোযোগী হন। তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হন যে, আল আজহারে ইসলাম সংস্কার করা হলে মুসলিম বিশ্বসহ সর্বত্র এর প্রভাব পড়বে। তিনি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, আল আজহার বর্তমান অবস্থায় চলতে পারে না। হয় এর সংস্কার করতে হবে নতুবা এটা ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য শেখ এবং উলামারা বিপরীত ধারণা পোষণ করায় বিরোধিতা অপ্রতিরোধ্য ছিল। এইভাবে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থতার পর্যবসিত হলেও তাঁর মৃত্যু পরবর্তী সংস্কারের জন্যে তা ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

হতাশ হয়ে শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্ আল আজহারের প্রশাসনিক কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি সম্পূর্ণ পশ্চিমা ধারায় একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যেই তাঁর স্বপ্নের সফলতা দেখতে পান। তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর ১৯০৮ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। ১৮৯৯ সালে বৃটিশের সমর্থনে শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্ মিশরের মুফতী নিযুক্ত হন। শরীয়তের সরকারী ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে যে কোন বিষয়ে তাঁর ফতোয়াই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা হতো। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামকে পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণ করা। তার দু'টি বিখ্যাত ফতোয়ায় মুসলমানদের জন্যে ছবি এবং মূর্তি

আইনসিদ্ধ এবং সুদের ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যাংকে মুসলমানদের টাকা জমা রাখার অনুমতি দেয়া হয়। তিনি মুসলমানদের জন্যে পশ্চিমা পোষাককেও গ্রহণযোগ্য বলে ফতোয়া দেন।

শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্ মানব মনীষার প্রাধান্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্ম কেবলমাত্র মানব মনীষার সহায়তা করে। যুক্তিই ধর্মের যথার্থ বিচারক। সবকিছুর উপরে ইসলাম যুক্তিভিত্তিক ধর্ম, তার সব আদেশ যুক্তি দিয়ে প্রামাণ্য। শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্ আধুনিক বিজ্ঞানে বিমোহিত ছিলেন। তিনি কোরআনের মধ্যেও তা পেতে চেয়েছিলেন। তাঁর একটি যুক্তির উদাহরণ– "উলামারা বলেন জ্বীন হচ্ছে অদৃশ্য জীবন্ত সত্তা। তবে অতি সম্প্রতি দূরবীনের সাহায্যে যেসব প্রাণীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোকেও জ্বীন বলা যেতে পারে। সাম্প্রতিক আবিষ্কারের আলোকে মুসলমানদেরকে চিরাচরিত ব্যাখ্যা পরিবর্তন করতে হবে। কোরআন আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধিতা করার মত অনুদার নয়।"

শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্ শুধুমাত্র পদার্থবিদ্যা বিষয়ক বিজ্ঞানের প্রাধান্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি নেতৃস্থানীয় পশ্চিমা দার্শনিকদের ব্যাখ্যানুযায়ী সামাজিক বিজ্ঞানের প্রাধান্যেও বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ডারউইনের বিবর্তনের মতবাদ কোরআনেও দেখা যায়।

১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত মিশরের সত্যিকার শাসক এবং মুসলিম বিশ্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম স্থপতি লর্ড ক্রোমার বলেছেন– শেখ মোহাম্মদ আবদুহ খুবই উন্নত প্রকৃতির আলেম ছিলেন। খুবই ভাল প্রকৃতির খেদাইব তৌফিক বৃটিশ চাপের মুখে তাঁকে ক্ষমা করেন এবং বিচারক নিযুক্ত করেন। ১৮৯৯ সালে মোহাম্মদ আবদুহ্ গ্র্যাণ্ড মুফ্‌তি নিযুক্ত হন। তিনি সততার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্ প্রশস্ত ও সজাগ মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রাচ্যের সরকারগুলোর অধীনে গজিয়ে উঠা কুপ্রথাকে স্বীকার করেন। তিনি সংস্কার কাজে ইউরোপীয়দের সহায়তার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্'র অবদান উল্লেখ করে বলতে হয় ভারতের

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মত তিনি মিশরে একটা চিন্তার জগত সৃষ্টি করেন এবং এর মাধ্যমে গোঁড়ামি মুক্ত একটি মুসলিম জাতির পত্তন করেন, তাদের কাজ খুবই কষ্টসাধ্য। সুতরাং তাঁরা সর্বপ্রকার উৎসাহ সমর্থন পাওয়ার যোগ্য। তাঁরা ইউরোপীয় সংস্কারকদের আত্মিক মিত্র। (আধুনিক মিশর পৃঃ ১৭৯-৮০)

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্যের সঙ্গে সহযোগিতা এবং আধুনিক জীবনের সঙ্গে ইসলামের আপোষ সংক্রান্ত শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্‌র আকাঙ্ক্ষার ফলাফল অমঙ্গলজনক প্রমাণিত হয়েছে। তিনি তাঁর পরবর্তী পাশ্চাত্য পন্থীদের জন্যে পথ প্রশস্ত করে দিয়ে যান। কাসিম আমীন, আলী আব্‌দ আর রাজিক, মোহাম্মদ কুরদ আলী এবং তাহা হোসাইন তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনকারী উদার ধারাকে যৌক্তিক সমাপ্তিতে টেনে নিয়ে যান। আশ্চর্যের ব্যাপার তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং শিষ্য রশিদ রিজা (১৮৬৫-১৯৩৫) তাঁর যুক্তিবাদে প্রতারিত হননি। রশিদ রিজা আবদুহ্‌র লেখা ও চিন্তার সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা করেই তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু বছর যেতে না যেতে তিনি তাঁর গুরুর যুক্তির ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেন। শেখ আবদুহ্'র মত পশ্চিমা সভ্যতার সত্যিকার প্রকৃতি সম্পর্কে রশিদ রিজার বিভ্রম ছিল না। জীবন সায়াহ্নে তিনি সঠিক ধারণা লাভ করেন এবং তাঁর গুরুর সবকিছুরই বিরোধিতা করেন।

বিশ্বস্ত সহধর্মিনী হিসেবে ঘরে নারীর স্থান। পারিবারিক, ব্যবস্থাপনায় ও সন্তান লালন-পালনে তার দায়িত্ব। পরিবার প্রধান ও পরিবারের ভরণ-পোষণে স্বামীর কর্তৃত্ব। স্ত্রীকে তালাক দেয়া এবং একাধিক বিবাহের বেলায় তার অধিকার, ১৩ শতক ধরে কোন প্রকার প্রশ্ন ছাড়াই আমাদের প্রিয় নবী, তাঁর সাহাবা, ইমাম, ঐতিহ্যবাদী, বিচারক, ধর্মতত্ত্ববিদ এবং সকল চিন্তার আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে মেনে আসছেন। মুসলিম বিশ্বের ওপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত সার্বজনীনভাবে গৃহীত এসব বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সামান্য প্রবণতাও কারও মধ্যে দেখা যায়নি। কোরআন এবং সুন্নায় নারীর যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে তাকেই নারী পুরুষ সকলেই সর্বোত্তম বলে মেনে নিয়েছেন।

কাসিম আমিনই প্রথম মুসলমান যিনি পর্দার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। কুর্দী বংশের এই লোকটি পেশাগত দিক থেকে বিচারক এবং শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্-এর শিষ্য ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি কায়রোতে কাটান। ফরাসী শিক্ষার সময় খ্রীষ্টান মিশনারীর তার্কিক ব্যক্তিরা তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, পর্দা, বহুবিবাহ এবং তালাক প্রথা মুসলমানদের দুর্বলতা ও অধঃপতনের কারণ। যতই তিনি আধুনিক পশ্চিমী সংস্কৃতি অধ্যয়ন করেন ততই তাঁকে হীনমন্যতায় পেয়ে বসে। তিনি লিখলেন; "পরিপূর্ণ সভ্যতা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার আগেই ইসলামী সভ্যতা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। সুতরাং একে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।" তিনি যুক্তি দিলেন "অতীতের সকল সভ্যতার মত ইসলামী সভ্যতারও ত্রুটি রয়েছে। পরিপূর্ণতার পথ হচ্ছে বিজ্ঞানে। ইউরোপ বিজ্ঞানে সবচাইতে অগ্রসর। সুতরাং ইউরোপ সামাজিক পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সব দিক থেকে ইউরোপ আমাদের অগ্রভাগে।

ইউরোপ বস্তুগত দিক থেকে আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু নৈতিকতার দিক থেকে আমরা শ্রেষ্ঠ– এই ধারণা ঠিক নয়। ইউরোপীয়রা নৈতিকতার দিক থেকেও আমাদের চাইতে অগ্রসর এবং তাদের সকল শ্রেণীই সামাজিক গুণে গুণান্বিত। ইউরোপে নারীর স্বাধীনতা আবেগ অনুভূতির ওপর নয় বরং যৌক্তিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক। ইউরোপের নৈতিকতা ছাড়া বিজ্ঞান গ্রহণ করার আশা বৃথা। দু'টি দিক অবিভাজ্য। অতএব আমাদেরকে জীবনের সার্বিক পরিবর্তনের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।"*

এসব চিন্তা কাসিম আমিনকে পর্দার বিরুদ্ধে বই লিখতে অনুপ্রেরণা যোগায়। ১৯০১ সালে The New Women গ্রন্থে তিনি লিখেন "পুরুষ নিরঙ্কুশ মনিব এবং নারী দাসী, সে পুরুষের ভোগ বিলাসের লক্ষ্য, এমন একটা খেলনা যা দিয়ে সে যখন যেভাবে খুশি খেলতে পারে। জ্ঞান পুরুষের জন্যে, অজ্ঞতা নারীর। উন্মুক্ত আকাশ আর আলো পুরুষের জন্যে, অন্ধকার এবং বদ্ধ কারাগার নারীর জন্যে। পুরুষ আদেশ দেবে নারী অন্ধভাবে তা মেনে চলবে। পুরুষেরই সবকিছু নারী সবকিছুরই অনুল্লেখ্য অংশ।"**

কাসিম আমিনই প্রথম মুসলমান যিনি পশ্চিমী ধারায় মুসলমান পরিবারের সংস্কারের বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর মতে মুসলিম বিশ্বের সামাজিক সমস্যার সমাধানের এটাই মহৌষধ। "প্রাচ্যের দেশগুলোর দিকে তাকাও দেখবে নারীরা পুরুষের দাসী আর পুরুষেরা শাসকদের দাস, পুরুষ তার বাড়ীতে অত্যাচারী, শাসকদের কাছে অত্যাচারিত। ইউরোপের দিকে তাকাও! সরকার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, ব্যক্তিগত অধিকারের মর্যাদা দেয় এবং নারীর মর্যাদা চিন্তায় ও কাজে সর্বোচ্চ আসনে আসীন"।

কাসিম আমিনের মতে মুসলমানদের পতনের প্রকৃত কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা বশতঃ সামাজিক গুণাবলী নির্মূল করা। পরিবার থেকেই অজ্ঞতার শুরু। নারীর মর্যাদা বাড়াবার জন্যে কাসিম আমিন মহিলাদের জন্য আধুনিক পশ্চিমা শিক্ষার ওকালতি করেন। তাঁর মতে এই জ্ঞান তাদেরকে শুধু

---

* Arabic thought in the Liberal age, Albert Hourani, oxford University Press, London, 1962 p-168-169.

** Childhood in the Modern world, Samual Zwemer p-158.

ঘরকন্না করতে সাহায্য করবে না উপরন্তু জীবন ধারণের জন্যে আয়েরও সুযোগ দেবে। নারী আত্মনির্ভর না হলে তাকে সব সময় পুরুষের করুণার ওপর নির্ভর করতে হবে। আধুনিক শিক্ষা এই অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটাবে এবং তার নিঃসঙ্গতার অবসান করবে। নারীকে ঘরের মধ্যে নিঃসঙ্গ রাখা ক্ষতিকর, কারণ এটা অবিশ্বাসের শামিল। পুরুষ নারীকে সম্মান করে না। তারা নারীকে দরজা বন্ধ করে ঘরে রাখে কারণ তারা নারীকে সম্পূর্ণ মানুষ মনে করে না। পুরুষ নারীকে তার দেহ ভোগের কাজেই ব্যবহার করে। বহুবিবাহেও একই কারণ নিহিত। কোন মহিলাই স্বেচ্ছায় তার স্বামীকে অপর মহিলার সঙ্গে ভাগাভাগি করতে রাজী হবে না, যদি কোন পুরুষ দ্বিতীয় বিবাহ করে তবে তা প্রথম স্ত্রীর অজ্ঞাতেই করে থাকে। তালাক ঘৃণ্য, যদি তা মানতে হয় তাহলে নারীর তালাক দেয়ার অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। নারীরা কেন সমান রাজনৈতিক অধিকার পাবে না? তবে তাদের জনজীবনে অংশ গ্রহণের জন্যে পর্যাপ্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

The New Women খ্রীষ্টান ও মানবিক আদর্শের কাছে একজন নতজানু চিত্ত আধুনিক মুসলমানের অভিব্যক্তি। এটা পড়ে কারো পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে এর লেখক একজন মুসলমান, খ্রীষ্টান মিশনারী নয়!

The New Women-এ মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি দেয়া হয়েছে এগুলো ভিত্তিহীন। কাসিম আমিন মুসলমান নারীর অবস্থা খোলা মনে বিচার করার পরিবর্তে খ্রীষ্টানদের যুক্তিকেই অন্ধভাবে মেনে নিয়েছেন। সত্যিকার অবস্থা এই যে, এই ক্রমাবনতিশীল যুগে প্রায় প্রতিটি মুসলমান পরিবারে প্রেম-প্রীতি ও সমমর্মিতা বিরাজমান। মুসলমান সমাজের পারিবারিক বন্ধন যে কোন সমাজের চাইতে শক্তিশালী। পারিবারিক ঐতিহ্যানুসারে নারীরা স্ত্রী এবং মা হিসেবে মর্যাদা, সম্মান এবং শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। নারী স্বামীর অত্যাচারে নয় বরং নিজের স্বার্থেই পর্দা মেনে চলেন।

পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ পূজারী হিসেবে কাসিম আমিন ১৯০১ সালে ভাবতে পারেননি যে, পাশ্চাত্যের স্ত্রী পুরুষের সমানাধিকার আন্দোলন এক বংশ পর কিভাবে অপরাধ, বিশৃংখলা এবং সার্বজনীন অবৈধ যৌন সম্পর্কের

মহামারীর পথ প্রশস্ত করেছে। বাড়ী ও পরিবারের সম্পূর্ণ অনৈক্যের ফলে পশ্চিমী সভ্যতা নারীত্বের জন্যে বড় নিষ্ঠুর প্রমাণিত হয়েছে। একদিকে তারা চায় প্রকৃতির ভার নারী একলা বহন করুক এবং অপরদিকে সে চায় বাইরেও সে পুরুষের সঙ্গে বহুমুখী দায়িত্ব পালন করুক। এইভাবে তাকে দুটি শান পাথরের মাঝে আড়াআড়িভাবে বসানো হয়েছে। এছাড়া পুরুষদের কাছে লোভনীয় ও আকর্ষণীয় করে তোলার নামে তাদের স্বল্প পোষাক এমনকি নগ্নতার দিকে ঠেলে দেয়া হয়। তারা পুরুষদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে।

ইসলামই নারীর সব চাইতে বড় রক্ষা কবচ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ তা প্রতিটি নারীকে একজন পুরুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে এবং সকল পুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। প্রকৃতি প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের জন্যে ইসলাম তাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। অপরদিকে পশ্চিমা সভ্যতা তাকে অগণিত পুরুষের দাসীতে পরিণত করেছে এবং নারীত্বের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী সকল কাজের প্রতি তার বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করেছে। বাড়ী ও পরিবার সম্পর্কিত ইসলামের শিক্ষা সত্যিকার নারী প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।*

শতাব্দীর প্রারম্ভে কাসিম আমিন খ্রীষ্টান মিশনারী ও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন নিয়ে পর্দার বিরুদ্ধে বই-এর মাধ্যমে যে অভিযান শুরু করেছেন তার প্রচুর সাফল্য এসেছে। তাঁর চেষ্টার ফলে প্রতিটি মুসলিম দেশে মহিলারা আগাছার মত লাফাতে শুরু করলো এবং মুসলিম নারীর সত্যিকার ভূমিকা ধ্বংস করতে এবং পশ্চিম দেশের বোনের মত নিজের জীবনকে গঠন করতে কৃতসংকল্প হলো।

* মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর ব্যক্তিগত পত্র থেকে, ১লা এপ্রিল, ১৯৬১।

ডঃ তাহা হোসাইন : মিশরের বুদ্ধিজীবিদের মূর্ত প্রতীক

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ডঃ তাহা হোসাইন মিশরের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাঁর গুণগ্রাহীরা তাঁকে শেখ মোহাম্মদ আবদুহ্‌র শিষ্য বলতেন। তবে ডঃ তাহা হোসাইন কখনো তাঁর সাহচর্যে ছিলেন কিনা এটা সন্দেহের বিষয়। অবশ্য তাঁর আধুনিক চিন্তা এবং কাজকর্ম তাঁকে প্রভাবিত করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

নীল নদের উপরিভাগের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শিশু অবস্থায় তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত হন। অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাহা হোসাইন মাত্র ১৩ বছর বয়সে সম্পূর্ণ কোরআন মুখস্থ রাখার কৃতিত্ব দেখান। এই সময় তিনি হাফেজ হিসাবে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি লাভ করেন। কায়রোয় অধ্যয়নকালে তিনি ইউরোপীয় ছাত্রদের সাহচর্য লাভের চেষ্টা করেন। তাদের সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে হতাশায় তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন, তাঁর এই প্রাথমিক জীবনের বিবরণ আধুনিক আরবী ভাষায় লিখিত 'দিনের স্রোত' নামক আত্মজীবনীতে রয়েছে। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তাঁকে পি এইচ ডি ডিগ্রী দেয়া হয় এবং সরকারী বৃত্তি দিয়ে প্যারিসে অধ্যয়নের জন্যে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি আরেকটি পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন এবং তাঁর স্ত্রী সুজানে ব্রেসু-র সাক্ষাৎ পান। ১৯১৮ সালে তিনি এই মহিলাকে বিয়ে করেন। মিশরে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পরে এর ডীন নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি তাঁর বিতর্কিত গ্রন্থ 'ইসলামী গোঁড়ামীর' তীব্র সমালোচনা সম্বলিত বইটি রচনা শুরু করেন।

১৯২৬ সালে প্রতারণামূলক শিরোনামযুক্ত 'ইসলাম পূর্ব কবিতা সম্পর্কিত বইটি প্রকাশিত হলে বোমা বিস্ফোরিত হয়। এই বই এর লক্ষ্য ছিল কোরআন এবং হাদীসের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা। খোদা মানুষের মন সৃষ্টি করেছেন যা সন্দেহ করে তৃপ্তি এবং উদ্বেগ ও বিমূঢ়তার

মধ্যে আনন্দ পায়। এই পদ্ধতির প্রয়োজনীয় ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার পরিণাম বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই গ্রন্থে ডঃ তাহা হোসাইন ইসলামের ইতিহাসের প্রথমদিকের চিন্তানায়ক, বিচারক এবং ধর্মতত্ত্ববিদদের সম্পর্কে পরিহাস করার কোন সুযোগই নষ্ট করেননি। তাঁর মতে তাঁরা স্পষ্ট চালাকির দ্বারা কোরআন সৃষ্টি এবং হাদীস তৈরী করেছেন। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি আরও লিখেন মূসা (আ) নামে কেউ ছিলেন না এবং ইব্রাহিম (আ) ও ইসমাঈল (আ) সম্পর্কিত কোরআনের কাহিনী রূপকথার রাজ্য থেকে নেয়া। তাওরাতে ইব্রাহিম এবং ইসমাঈল সম্পর্কে বলা হতে পারে এবং কোরআন ও তাদের কথা বলতে পারে কিন্তু কোরআন এবং তাওরাতে তাদের কথা বলাই তাদের অস্তিত্বের জন্যে যথেষ্ট নয়। কোরআনে ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাঈলের মক্কায় অভ্যুদয়ের কথা এবং সেখানে আরব জাতির জন্মের কথা বলা হয়েছে। আমরা এই গল্পের মধ্যে আরব এবং ইহুদী জাতি এবং ইসলাম ও ইহুদী ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্যে এক ধরনের রূপকথা দেখতে বাধ্য।*

তাঁর অপর গ্রন্থ The Future of Culture in Egypt সমসাময়িকদের মনে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের লক্ষ্য হচ্ছে মিশরকে সাংস্কৃতিক দিকে থেকে ইউরোপের অংশ হিসাবে প্রতীয়মান করা এবং সেভাবে জনশিক্ষার কর্মসূচী প্রণয়ন। ডঃ তাহা হোসাইন বলেন– মিশর কি পূর্বের না পশ্চিমের? আমরা বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবে করতে পারি। একটি মিশরীয়মন কি চীনা, বা হিন্দু বা ইংরেজ অথবা ফরাসীকে সহজে বুঝতে পারবে? আমাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি সম্পর্কে চিন্তা করার আগে আমাদেরকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। (পৃঃ ৩)

এরপর তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন : ইতিহাসের শুরু থেকে দু'টি পৃথক প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতা বিরাজমান ছিল। একটি ইউরোপের অপরটি দূর প্রাচ্যে। ইতিহাসের কি সরল ব্যাখ্যা! যদি স্মরণাতীত সময় থেকে ইউরোপেই একক সভ্যতা না থেকে থাকে দূর প্রাচ্যের ব্যাপারে এটা কতদূর প্রযোজ্য। দূর

* Egypt in search of political Community p-155.

প্রাচ্য সাংস্কৃতিক দিক থেকে কখনো একরূপ ছিল না। হিন্দু ভারত এবং কনফুশিয়াসের চীনের পার্থক্য মধ্যযুগীয় ইউরোপের সঙ্গে পার্থক্যের মতই সুস্পষ্ট।

গ্রীসের সঙ্গে প্রাচীন মিশরের সম্পর্ক এবং দূর প্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবের কারণে ডঃ তাহা হোসাইন যুক্তি দেন যে, মিশর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সব সময় ইউরোপের অবিচ্ছেদ্য অংগ ছিল। বিজ্ঞ ডক্টর ভুলে গেছেন যে, কেবলমাত্র মহামতি আলেকজাণ্ডারের দ্বারা হেলেনীয় যুগেই মিশর সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইউরোপের সঙ্গে এক ছিল। তবে pericles এবং Byzantium এর এথেন্স এর চাইতে ফেরাউনী এবং ইসলামী মিশরের ঐতিহাসিক পারম্পর্য কম ছিল।

ডঃ তাহা হোসাইন জোর দিয়ে বলেন ইসলাম এবং আরবী ভাষা গ্রহণের ফলে মিশর যতটুকু প্রাচ্য রূপ নিয়েছে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে ইউরোপ তার চাইতে বেশী পরিবর্তিত হয়েছে। মিশরের সবচাইতে বিজ্ঞ ব্যক্তি ইসলাম এবং খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে কোন ঐতিহাসিক পার্থক্য স্বীকার করেন না। তাঁর দেশের পশ্চিমীকরণে ইসলামের কোন বাধা নেই– এ কথা প্রমাণের জন্যে তিনি ইতিহাসের ঘটনাবলীর নীতি জ্ঞান শূন্য বিকৃতি ঘটিয়েছেন।

"আমরা মিশরীয়রা পশ্চিম থেকে আমাদের গ্রহণের পরিমাণের ভিত্তিতে আমাদের জাতীয় অগ্রগতি পরিমাপ করে থাকি। আমরা ইউরোপের কাছ থেকে শিখেছি কিভাবে সভ্য হতে হয়। ইউরোপীয়রা আমাদের টেবিলে বসে কাঁটা চামচে খেতে শিখিয়েছে। মেঝে শোওয়ার পরিবর্তে বিছানায় শু'তে এবং পশ্চিমা পোষাক পরিধান করতে শিখিয়েছে। আমরা আমাদের সরকার পরিচালনার জন্যে খেলাফত থেকে কোন পথনির্দেশ চাই না। এর পরিবর্তে আমরা জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষ আদালত প্রতিষ্ঠা করেছি, ইসলামী আইনের বিকল্পে পশ্চিমা ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন করেছি। আমাদের সময়ের অনস্বীকার্য সত্য হচ্ছে আমরা দিন দিন ইউরোপের নিকটবর্তী হচ্ছি এবং সবদিক থেকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হচ্ছি। (পৃঃ ১১-১২)

ডঃ তাহা হোসাইনের মতে ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিশরীয়দের মৌলিক পার্থক্য থাকলে পশ্চিমীকরণ কষ্টকর হবে। একইভাবে এই ব্যাপারে

জাপানের তুলনায় পিছিয়ে থাকার জন্যে তিনি তাঁর জাতিকে তিরস্কার করেন– আমরা কি চীনের ধর্ম ও দর্শন গ্রহণ করবো যখন তারা দ্রুত পশ্চিমীরূপ নিচ্ছে? যেসব মিশরবাসী পশ্চিমা সভ্যতাকে উপহাস করে তারা কখনো চীনা বা হিন্দুদের মত বাস করতে চাইবে না।

ডঃ তাহা হোসাইন কেন চেয়েছেন তাঁর জাতি দু'টির যে কোন একটি গ্রহণ করুক। কেন মিশরীয়দেরকে হয় ইংরেজ নতুবা চীনা হতে হবে? কেন তারা মুসলমান হিসেবে গর্ববোধ করবে না। ডঃ তাহা হোসাইন উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে এই প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। সম্ভবতঃ স্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার ধারক হিসেবে ইসলামকে তাঁর পাঠকদের চোখে খাট করার জন্যই তিনি এই প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন।

'মিশর ইউরোপের অংশ' খেদিব ইসমাঈলের এই বিবৃতিতে বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন নেই। খোদা যদি আমাদেরকে তুর্কী বিজয় থেকে রক্ষা করে থাকেন আমরা ইউরোপের সঙ্গে এবং তার রেনেসাঁর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য থাকব। এটা মিশরীয়দের জন্যে নিশ্চয়ই একটা স্বতন্ত্র সভ্যতার সৃষ্টি করবে, যার মধ্যে আমরা এখন বাস করছি (পৃঃ ৯)। অবশ্য খোদা আমাদের দুর্ভাগ্য এবং দুর্যোগ পুষিয়ে নেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। বর্তমান অগ্রগতি সাধনের জন্যে বিশ্বকে শত শত বছর সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। এক জেনারেশনের মধ্যেই এখন আমরা সেই অগ্রগতি সাধন করতে পারব। সুযোগ গ্রহণ না করলে আমাদের জন্যে তা দুঃখজনক হবে। সত্যিকার ঘটনা হচ্ছে মধ্যযুগে ইসলামী বিশ্বে যা বিরাজিত ছিল ইউরোপীয়রা তা গ্রহণ করেছে। আমরা এখন যা করছি তারাও তাই করেছে। এটা মাত্র সময়ের হেরফের। (পৃঃ ১৩)

ডঃ তাহা হোসাইনের মত অধিকাংশ হীনমন্য সাহিত্যিকদের মত হচ্ছে– ইউরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার প্রেরণা সঞ্চার করেছে, সেই কারণে পশ্চিমীকরণ প্রচেষ্টায় মুসলমানরা শুধু মাত্র তাদের ঐতিহ্যিক অধিকার ফিরে পাওয়ার দাবী করছে। এই ধরনের ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তি দিয়ে আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানরা তাদের ঈমান পরিত্যাগ করাকেই আইনসঙ্গত করতে চাচ্ছে। ডঃ তাহা হোসাইন এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করছেন যে, মুসলিম বিশ্ব থেকে গ্রীক শিক্ষা ইউরোপে আসার

অর্থ কখনো তাকে ইসলামী সভ্যতার অংশ হওয়া নয়। যদিও মধ্যযুগের ইউরোপ মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের সাফল্যকে স্বাগত জানিয়েছে, সে কখনো তার সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ত্যাগ করেনি, যা ডঃ তাহা হোসাইন তাঁর দেশের জন্যে চাচ্ছেন।

"কোন শক্তিই মিশরীয়দেরকে ইউরোপীয় জীবন পদ্ধতি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। সভ্যতার ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হওয়ার জন্যে মিশরীয়দেরকে পুরোপুরি পশ্চিমা সভ্যতার অনুকরণ করতে হবে। যে এর বিপরীত পরামর্শ দেবে হয় সে প্রতারক নতুবা নিজে প্রতারিত। (পৃঃ ১৫)

১৯৫২ সালে বাদশাহ ফারুককে ক্ষমতাচ্যুত করার কিছু পূর্ব পর্যন্ত ডঃ তাহা হোসাইন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর কর্মসূচী বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়কে যুগোপযোগী করার জন্যে বিস্তারিত পরামর্শ দেন। প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসের তাঁর এই পরামর্শ গ্রহণ করে ১৯৬১ সালের ১৮ই জুলাই এক আদেশ জারী করেন। এই আদেশে আল আজহার তার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ডঃ তাহা হোসাইনের কর্মসূচী মোতাবেক প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসের আল আজহারে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেন। নতুন পরিকল্পনায় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অপাংক্তেয় এবং নৈর্বাচনিক বিষয়ে পরিণত হয়। ডঃ তাহা হোসাইনের পরামর্শে প্রেসিডেন্ট মাত্র একটি আঘাতে বিশ্বের ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ধ্বংস করে দেন।

ডঃ তাহা হোসাইনের পক্ষ সমর্থনকারী ক্ষমা প্রার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন তিনি যৌবনের কার্যাবলীর জন্যে দুঃখিত, তার সাম্প্রতিক লেখায় ইসলামের প্রতি বেশ আনুগত্যের স্বাক্ষর রয়েছে। সুতরাং তার পূর্বেকার কাজের জন্যে তাকে ক্ষমা করা উচিৎ। আমি তা বিশ্বাস করি না। তার লেখার কুফল রচনার সময়ের চাইতে এখন বেশী প্রকট অথচ তিনি প্রকাশ্যে আগের লেখার ভুল স্বীকার করেননি এবং এ জন্য ক্ষমাও প্রার্থনা করেননি।

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে
ইসলাম বনাম আরববাদ

অনেক সরলপ্রাণ কিন্তু ভুল পথে পরিচালিত মুসলমান বিশ্বাস করেন আল্লাহ আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছেন, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) এবং তার প্রাথমিক অনুসারীরা ছিলেন আরব অতএব সমগ্র আরব ঐতিহ্য ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শত শত বছর ধরে মুসলমানরা এই বংশসূত্রে গর্ববোধ করে আসছেন অথচ তারা ভুলে যান যে, ইসলামের সবচাইতে বড় শত্রু আবু জেহেল, আবু লাহাব মহানবীর খুবই নিকটতম আত্মীয় ছিলেন। সরলপ্রাণ মুসলমানরা আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে চিন্তা করে থাকেন– আরবই হচ্ছে দারুল ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র অতএব পর্যায়ক্রমিক মুসলিম ঐক্যের জন্যে আরবের সংহতির সংগ্রাম অপরিহার্য। তাদের মতে আরব জাতীয়তাবাদ বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহ প্রকাশ করে। এসব সরলপ্রাণ লোকেরা যদি আরববাদের সূত্রপাত, ইতিহাস এবং আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হতেন তাহলে কখনো তাকে ইসলামের সঙ্গে গোঁজামিল দেয়ার কথা ভাবতেন না।

বর্ণ, ভাষা, গোত্র এবং স্বাদেশিকতার শ্লোগান আরব জাতীয়তাবাদ হাজার হাজার বছর আগে প্রাক-ইসলামী আরবে জন্ম নেয়। যখন কোরআন এবং মহানবী (সা)-এর শিক্ষায় খুব জোর দেয়া হলো যে, ঈমানদাররা বর্ণ, ভাষা, জন্মসূত্র নির্বিশেষে একে অপরের ভাই তখন তারা খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে প্রতিটি মানুষকে তার কাজের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে অপরদিকে আরববাদের শিক্ষা ছিল তার জবাব দিতে হবে গোত্র প্রধানের কাছে। তার নিজের গোত্রের বাইরে যে কোন নিষ্ঠুর আচরণের অনুমতি ছিল। প্রাচীন আরবদের সত্যিকার কোন ধর্ম ছিল না। আধুনিক ইউরোপীয়

ও মার্কিনীদের মত তারা পুরোপুরি বস্তুবাদী ছিল। হযরত (সা)-এর জন্মের প্রায় একশত বছরে আগের একটি কবিতায় পার্থিব জীবনের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার মূল বক্তব্য হচ্ছে– সুস্বাদু খাদ্য, সুপেয় পানীয়, সুন্দরী নারী, আরাম-আয়েশের জীবনই মানুষের একমাত্র কাম্য। জীবন সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ হোক মৃত্যু অনিবার্য। অতএব যেটুকু সময় হাতে পাওয়া যায় তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা দরকার। আরবী সাহিত্যের সবচাইতে উচ্চ প্রশংসিত কবিতা হচ্ছে ইমরুল কায়েসের 'the golden ode' নবীর জন্মের প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে এটি রচিত হয়। 'মোয়াল্লাকাত' কবিতায় কবি তার চাচাতো বোনের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের যে বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যে দৈহিক সংসর্গ, যৌন সম্ভোগ, রূপের বর্ণনা, সঙ্গমের আগে ও পরের অনুভূতি তার প্রতি চাচাতো বোনের আচরণ– প্রভৃতি ইনিয়ে বিনিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

এইভাবে প্রাক ইসলামী আরবী সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ভোগবাদী ও বস্তুবাদী দর্শনে আকীর্ণ ছিল। আব্বাসীয় এবং উমাইয়া শাসনামলেও এসব অনিষ্টকর জিনিসের প্রাধান্য বিরাজিত ছিল। অপরদিকে প্রাক ইসলামী আরবের সারল্য, মনুষ্যত্ব, সাহস এবং কঠোর পরিশ্রমের দিকটি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হয়। ৮১০ খৃঃ আবু নুয়াসের কবিতায় তার জন্মস্থান বাগদাদের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাতে ভোগ বিলাস এবং আরাম-আয়েশের কথা ছাড়া আর কিছু নেই।

ইসলামের আবির্ভাবের শত বছর পরও জাহেলিয়াত বা অন্ধকার আরব যুগের আচার প্রথার প্রাধান্য বিরাজিত ছিল। প্রাক ইসলামী আরব যুগের ক্লাসিক্যাল কবিতার যুগের পর আরেকজন কবি খুবই সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি হচ্ছেন আবু তৈয়ব আল মুতান্নবী। তার নামের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ভূয়া নবী। তাঁর কবিতায় তিনি প্রাক ইসলামী আরব পূর্বসূরীদের আদর্শকে সমুন্নত করেন। আরবী সাহিত্যের অপর খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব সিরিয়ার অন্ধ কবি আবুল আলা মারী (৯৭৩-১০৫৭)। তিনি তার 'লুজুমিয়াত' কবিতায় নাস্তিকতার প্রচার করেন।

এইসব কবিরা তাদের কাব্যের মধ্য দিয়ে যে ভাব প্রকাশ করেছেন তা আরবী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামের বিশ্বাস এবং

ইসলামী ধ্যান-ধারণা সঙ্গে এ সবের কোন সঙ্গতি নেই। পাঠক আরব সংস্কৃতির আবরণে আরব জাতীয়তার কিছুটা পরিচয় পেলেন। আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করব। অনেকে জেনে আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, মার্কিন প্রটেষ্টান্ট মিশনারীদের সরাসরি প্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতায় লেবাননে প্রথম আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন দু'জন খ্রীষ্টান পণ্ডিত Nasif yazeji (১৮০০-১৮৭১) এবং utrus Bhustani (১৮১৯-১৮৮৩)। তাদের নীতি বাক্য ছিল দেশপ্রেম ঈমানের একটি অঙ্গ। পশ্চিমা পাণ্ডিত্যের চশমায় আরব ইতিহাস অধ্যয়ন করে তারা সিদ্ধান্ত পৌছেন যে, আরবী সভ্যতার উপকরণ ইসলামের অধীন নয়। তারা আরব প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কবিতার দ্বারা তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের উত্তেজিত করেন।

বৈরুতের মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরব জাতীয়তাবাদ আন্দোলন চূড়ান্ত শক্তি লাভ করে। ১৮৬৬ সালে মিশনারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম দিকে সিরীয় প্রটেষ্টান্ট কলেজ নামে পরিচিত এই কলেজের প্রভাব শীগগীরই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে অনুভূত হয়। বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের শত্রু সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষ স্বাতন্ত্রের দাবী করতে পারে। খুবই চাতুর্যের সঙ্গে মুসলমান ছাত্রদের বিভিন্ন পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্য বহির্ভূত কাজের মাধ্যমে ইসলামের আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানসিকভাবে গড়ে তোলা হয়। ইসলাম বিরোধী প্রচারণা এতই শক্তিশালী ছিল যে, অধিকাংশ ছাত্রই ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে। সব চাইতে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে এসব ব্যক্তিরাই বংশ পরম্পরায় আরব বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করে।

প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে মিশর-এর দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। কারণ তুর্কী অত্যাচারে বহু খ্রীষ্টান এবং মুসলমান গ্রাজুয়েট সেখানে আশ্রয় নেয়। খেদিব ইসমাঈল তাদের স্বাগত জানান তাঁর নীতিবাক্য "মিশর ইউরোপের একটি অংশ।"

মিশরে প্রথম যিনি জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম করেন তিনি হচ্ছেন লুৎফী আসসাঈদ। শিষ্যদের কাছে তিনি ছিলেন জেনারেশনের শিক্ষক। তিনি ফেরাউনের কাছ থেকে সাংস্কৃতিক প্রেরণা লাভের জন্য তার দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন প্যান ইসলামের জন্যে আমাদের কোন

সহানুভূতি নেই কারণ এটা ধর্ম এবং আমাদের বিশ্বাস জাতীয়তা ও প্রগতিই আমাদের খ্যাতনামা পদক্ষেপের পথ নির্দেশিকা। লুৎফী আসসাঈদের একজন খ্যাতনামা সহকর্মী হচ্ছেন সাদ জগলুল। তার সময়ই মিশরের রাজনীতি থেকে ইসলামের সর্বশেষ প্রভাব বিতাড়িত হয়। তার নীতিবাক্য ছিল– "ধর্ম আল্লাহর জন্যে এবং দেশ জনগণের জন্যে।" আজ পর্যন্ত তিনি আরব জাতীয়তাবাদের গুরু হয়ে আছেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে মুসলমানদের উচিত আরব জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন করা এই মনোভাব প্রচার পদ্ধতির প্রতারণামূলক ভ্রান্তি। আরব বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সতর্ক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার পরিবর্তে তাকে উৎসাহিত করার জন্যেই সবকিছু করেছেন।

ফিলিস্তিনের দুঃখজনক ঘটনা শুধু আরবদের নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্যে একটা দুর্যোগ। জাতীয়তাবাদীরা ফিলিস্তিনে আরব অধিকারের মূখ্য রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেদেরকে তুলে ধরে সকল মুসলমানের কাছ থেকে ব্যাপক সহানুভূতি পেয়েছেন। অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে তারা কেবল এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখেছেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু আমরা কি দেখি? ইংরেজদের কাছে যেমন ইংল্যান্ড ঠিক তেমনি ইহুদীদের কাছে ফিলিস্তিনকে গড়ে তুলতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ Chaim weizmann এবং অন্যান্য শীর্ষ স্থানীয় নেতার সঙ্গে আমীর ফয়সল আপোষ আলোচনা করেছেন। পরবর্তী দশকে ইহুদীরা ক্রমেই শক্তিশালী হয়েছে। তবে তার মত অনেক আরবই ইহুদীদের কাছে জমি বিক্রি করে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছেন। ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে ওয়াশিংটনে সিরিয়ার সাবেক মন্ত্রী এবং সিরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর Dr. Zurayk 'the meaning of disaster' নামে ফিলিস্তিন সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি লিখেন– ইস্রাইলের ইহুদীরা বর্তমানে বাস করছে, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে আর আমরা আরবরা এখনও অতীতের স্বপ্ন দেখছি। আরবদের চিন্তা ও কাজে বিপ্লব সাধন করে নতুন সমাজ গঠন করতে হবে। এই সমাজকে হতে হবে গণতান্ত্রিক সর্বোপরি প্রগতিমনা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে–

১. রাষ্ট্র থেকে ইসলামের প্রভাব সম্পূর্ণ নির্মূল করতে হবে।

২. শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগিক ও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পশ্চিমা সভ্যতার বস্তুগত দিকের প্রতি উদারমনা হতে হবে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, ইহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে জাতীয়তাবাদীরা ইহুদীদের অনুসারী হওয়া অপরিহার্য মনে করতেন। যারা আধুনিক আরব জাতীয়তাবাদ ও ইসলামের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না তাদের জন্যে কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হলো– আরবী ভাষা প্রসঙ্গে বুলেটিন অফ দি ইজিপশিয়ান এডুকেশন ব্যুরো পত্রিকার ১৯৪৭ সালের মে সংখ্যায় The teaching of Arabic শিরোনামে আহমদ খাকী লিখেন– মিশরের কথিত আরবী, আঞ্চলিক আরবী এবং কোরআনের ক্লাসিক্যাল আরবীর মধ্যে বিরাট ব্যবধান বিরাজমান। আমাদের অধিকাংশ শিশুই চিন্তা ও কথা বলে একভাবে এবং পড়ে ও শিখে অন্যভাবে। যদিও ভাষার দু'টি ধারার মধ্যে একই শব্দ রয়েছে, লিখিত ভাষার জন্যে ব্যাকরণের যে নীতি অনুসৃত হয় তাতে অনেক শব্দের রূপ পরিবর্তন ও অবস্থানের পরিবর্তন প্রয়োজন। না হয় ১০ বছরের আরব বালকের জন্যে কোরআনের ভাষা বোধাতীত থেকে যাবে।

যতদিন বাড়ীতে কথিত আরবী ভাষা আঞ্চলিক থাকবে এবং যতদিন স্কুলের পাঠ্যক্রমের অধিকাংশ ভাষা এই আরবী থাকবে ততদিন এটাই প্রধান জীবন্ত ভাষা। কোরআনের ক্লাসিক্যাল ভাষা বিশ্বাস হিসেবেই থেকে যাবে। আমাদের যুবকেরা এ ধরনের বিলাস বরদাশত করবে না এবং এটা যদি তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়, এটাতে পাণ্ডিত্য অর্জিত হল কি না সে পরোয়া তারা করবে না।

The ideas of Arab nationalism গ্রন্থে জর্দানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী Hasem Zaki nuseibah বলেছেন– আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে একটি জাতি হিসেবে আবরদেরকে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। বস্তুতঃ তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে একজন আরবের কাছে ধর্মই যখন জীবনের ভিত্তি হয় তখন ভাল ব্যবহারের গুণাগুণ ও মাপকাঠি নির্ধারিত থাকে। এই মাপকাঠি সকল সময় এবং সব জায়গায় গৃহীত হয়। উদাহরণ

হিসেবে বলা হয়েছে– ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তির কারণে ইসলামের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য উমাইয়া শাসনকে সার্বজনীনভাবে নিন্দা করা হয়ে থাকে। এসব ইতিহাসের অধিকাংশই আব্বাসীয় যুগে লেখা হয়েছে, ফলে পক্ষপাতিত্ব এড়ানো সম্ভব হয়নি। অবশ্য এতেও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কারণে উমাইয়ারা সাধারণ মুসলমানদের বিরাগভাজন হন।

একজন আধুনিক আরব জাতীয়তাবাদীকে উমাইয়াদের প্রতি তার পূর্ব পুরুষদের দেয়া রায়কে পুনঃ ব্যাখ্যা ও পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। আধুনিক জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণায় উমাইয়াদের ধর্মনিরপেক্ষ কাজের প্রশংসা করতে হবে যা এক সময় নিন্দিত হয়েছিল। উমাইয়াদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আরবদের ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটেছে পৃঃ ৬১-৬২। National consciousness গ্রন্থে Dr. Zurayk ইসলামের ইতিহাসকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে– মুহাম্মদ (সা) শুধু আরবদের নবী ছিলেন না বরং আরব ঐক্যের স্থপতি ছিলেন। কেউ কেউ বলতে পারেন তখন ধর্মীয় বন্ধন জাতি বন্ধনের চাইতে শক্তিশালী ছিল এবং ইসলাম আবরবাদের চাইতে জোরদার ছিল। এর উত্তর হচ্ছে মধ্যযুগে এর বিপরীত হওয়া সম্ভব ছিল না এবং এটা ইসলামিক প্রাচ্য ও খ্রীষ্টিয় পাশ্চাত্যের বেলায় একইভাবে সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিকে আমরা আরবদের মধ্যে বেশ সচেতনতা দেখতে পাই যখন ধর্মীয় আবেগ খুবই উত্তপ্ত ছিল। মুসলমানরা অনারব খ্রীষ্টানদের চাইতে আরব খ্রীষ্টানদের প্রতি অনেক উদার ছিলেন এবং কিছু আরব খ্রীঃ প্রথম দিকে মুসলমানদের পাশাপাশি ধর্ম প্রচার করেছেন। আরব গোত্রের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পর এই আরব সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পায়। পার্সী, তুর্কী এবং অন্যান্যদের হামলার মোকাবিলায় এই ভাব আরও জোরদার হয়। এই ভাব আজ পর্যন্ত জোরদার হচ্ছে, জাতীয়তাবাদের বন্ধন অন্য সকল বন্ধনের চাইতে শক্তিশালী।

(পৃঃ ১২৮-৩২)

এর ফলে আমরা দেখি প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসের মিশরের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আসওয়ান বাঁধের ফলে সৃষ্ট পানিস্ফীতি

থেকে প্রাক-ইসলামী আরবদের মন্দির এবং মূর্তি রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সব সময় ফেরাউনের গুণকীর্তন করে গান গাইতেন এবং তাকে আরবদের গৌরব বলে আখ্যায়িত করেন। কায়রোয় বিরাট মূর্তি স্থাপন করে তার স্মৃতি রক্ষা করা হয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি আরব প্রত্নতত্ত্ববিদরা শীগগীরই আরব ঐতিহ্য বৃদ্ধির জন্য বালি খনন শুরু করবেন। তারা কি পাবেন বলে মনে করেন! হুব্বাল, আললাত, আল মানাত, আল উজ্জা! হ্যাঁ এসব মূর্তি পুনরায় কাবা গৃহে স্থাপিত হবে এবং তখন হজ্জের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে আবু জেহেল ও আবু লাহাবের প্রশংসা কীর্তন করে কে কত সুন্দর কবিতা লিখতে পারে। এই হবে জাতীয়তাবাদের প্রতিযোগিতা।

এই বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্যে আরব মুসলমানদেরকে সজাগ হতে হবে এবং এই পদক্ষেপসমূহ নিতে হবে :

১. ডঃ সাইদ রজমানের নেতৃত্বে আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন-এর পুনরুজ্জীবনের জন্যে পূর্ণ সমর্থন ও আর্থিক সহযোগিতা দিতে হবে। মুসলিম ভ্রাতৃসংঘই আরবে একমাত্র আন্দোলন যা নির্ভেজাল ইসলামের প্রচার করেছে এবং জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিরোধ করতে সক্ষম। বিশ্বের অন্যান্য যায়গার মুসলমানদেরও ইখওয়ানের পুনরুজ্জীবনের জন্যে মিশরের উপর চাপ সৃষ্টি করা উচিৎ।

২. আরবের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে এটা বোঝাতে হবে যে, আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগান খ্রীষ্টান মিশনারী, ইহুদীবাদ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত। আরবদেরকে ইসলামী বিশ্ব থেকে দূরে সরানোই এই চক্রান্তের একমাত্র লক্ষ্য।

৩. আরব নেতাদেরকেও বুঝাতে হবে যে, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র বা মার্কসবাদ নয় বরং ইসলামই আরব ঐক্য সংহত করতে পারে। বিশ্বের মুসলমানদের সঙ্গে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও গণসংযোগ মাধ্যমের সাহায্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৪. আরব যুবকদেরকে বোঝাতে হবে যে, ফিলিস্তিন সমস্যা কেবল আরবদের নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উদ্বেগের কারণ। ইহুদীবাদের

বিরুদ্ধে বিলম্ব ছাড়াই সর্বাত্মক জিহাদ সংগঠন করতে হবে। মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্বের মুসলমান যুবকদেরকে নিয়ে আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

৫. এই ব্যাপারে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের (১৩৩২-১৪০৬) মন্তব্যের প্রতি আমি আরবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি– নবীর ঐশী বাণী ছাড়া রাজনৈতিক ঐক্য ও স্থায়িত্ব অর্জনে আরবরা অক্ষম। কারণ চারিত্রিক কঠোরতা, গর্ব, বর্বরতা এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি হিংসা তাদের মজ্জাগত। ইচ্ছা ও আকাঙ্খার ঐক্য ছাড়া এগুলো দূরীভূত হওয়া খুবই কষ্টকর। নবীর ধর্মই তাদের রুক্ষতা ও প্রতিহিংসাকে দমন করতে পারে। কারণ এই ধর্মই তাদেরকে বর্বর জাতি থেকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছে। তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়া উচিৎ যিনি তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান জানাবেন, অসত্য থেকে বিরত রাখবেন। তবেই তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে এবং নেতৃত্ব করতে পারবে। (মুকাদ্দীমা)

"ইসলামী" জাতীয়তাবাদ

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন যে, কেয়ামতের আগে মুসলমানরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের অনুকরণ করবে। এই ভবিষ্যৎ বাণী কার্যকর হয়েছে। বিধর্মীদের অনুকরণের ক্ষেত্রে সবচাইতে জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের যায়গায় আধুনিক ভৌগলিক, বর্ণ ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাকে স্থান দেয়া। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বিশ্ব মুসলিম সংহতির পক্ষে যেরূপ ক্ষতির কারণ হয়েছে ঠিক তেমনি ঈমানকে আরেকটা জাতীয়তাবাদ হিসেবে দেখার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। নতুন 'ইসলামী' জাতীয়তা জোর দিচ্ছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের খারাপ দিক, অমুসলমানদের হাতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের দুঃখ দুর্দশা, সর্বোপরি 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও পশ্চিমী ধারায় সামাজিক 'অগ্রগতি'র ওপর। এ ব্যাপারে মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের ধারণা ইসলাম মুসলমানদের তাৎক্ষণিক বস্তুগত কল্যাণের নিমিত্তে অপর একটি রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতি। তারা কখনো খোদাভিত্তিক, শেষ বিচারের দিন বা পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ -অকল্যাণের কথা বলে না।

অমুসলমানদের হাতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অত্যাচার, ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরের মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলার পরক্ষণেই তারা শিল্পোৎপাদনে ক্ষতি করে রোজা রাখার নিন্দে করেন, ঈদুল আযহার দিনে পশু জবাই করে আর্থিক ক্ষতির কথা বলেন এবং 'বৈদেশিক মুদ্রার নিদারুণ' ঘাটতির অজুহাতে হজ্জযাত্রীর সংখ্যা কমিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। এর পরও তারা সদম্ভে বলে থাকেন যে, 'আমরা মুসলমান'। মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের কাছে ইসলাম কোন ধর্ম নয়– আরেকটি রাজনৈতিক শ্লোগান।

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতা ডঃ সাইদ রমজান পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন : মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা কোন সময় বংশগত বিরোধ, বা উগ্র স্বদেশ প্রেমিক এবং কোন সময় ইসলামের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের মধ্যে তাদের আবেগের স্ফূরণ দেখতে পান। বস্তুতঃ এটা এ সবের সমষ্টি হতে পারে। এ ধরনের আন্দোলন যদি সফল হয় 'ইসলামাবাদ' আরেকটি উগ্রতায় রূপ নেবে। এটা তখন একটি নতুন ধরনের জাতীয়তার জন্ম দেবে। এখন পর্যন্ত আমাদের দাবী হচ্ছে– আমরা মিশরী বা সিরীয় বা আরব অথবা অনারব। এখন আমরা বলতে শুরু করেছি 'আমরা মুসলমান'। এ ধরনের আন্দোলনের সাফল্যের অর্থ ইসলামের সাফল্য নয়... এটা কেবলমাত্র স্বদেশপ্রেমে অন্ধ আরেকটি দল সৃষ্টি যা ইসলামী নয়। ইসলাম বিশ্ব প্রভু আল্লাহর কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের নাম। জীবনের সবদিককে আল্লাহর আদেশের কাছে সোপর্দ করার নাম। এটা না হলে মুসলমানদের কোন ঐক্যই ইসলামী জামায়াত হতে পারে না।[১]

---

1. "Contemporary Islam and Nationalism-A case study of Egypt". Zafar Ishaq Ansari, The world of Islam vol. VII, No 1-4 E J. Brill, Leiden p.-16.

ইসলামের ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী জ্ঞানের সবচাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে কোরআনের ভিত্তিতে ইসলামের ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন। অতীতের মুসলিম সভ্যতার ব্যাপারে যেসব ব্যাখ্যা বর্তমানে চালু রয়েছে, তা ইসলামের জন্যে খুবই ক্ষতিকর। আমাদের পণ্ডিতেরা যতদিন এ ধরনের ক্ষমাপ্রার্থী রোমান্টিকতায় নিয়োজিত থাকবেন ততদিন ইসলামী পুনর্জাগরণ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের পর থেকে মুসলমানরা নিজেদেরকে এতই অপদস্ত ও হীনবল ভাবতে শুরু করেছেন যে, অতীতের কাল্পনিক চিত্র অংকন আমাদের লেখকদের ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। অতীত ঐতিহ্য গাঁথা প্রণয়নে তারা অনেক ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ির পরিচয় দিয়েছেন এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের বস্তুগত ও পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধিকে ইসলামী সমৃদ্ধি হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তারা কখনো বিষয়টি চিন্তা করে দেখেননি যে, এই পার্থিব উৎকর্ষতা ও শ্রীবৃদ্ধি ইসলামের কোন কল্যাণে এসেছে কিনা।

পণ্ডিতদের এটা জানা থাকা উতিৎ ছিল যে, মুসলিম ছদ্মাবরণে বিধর্মী আচরণকে কোরআন নিন্দে করেছে। অতীতের ব্যাপারে আমাদের মতামত পুনর্গঠনে আমাদেরকে এই মুহূর্তে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী বিকৃত দৃষ্টিতে ইতিহাসের মূল্যায়ন বন্ধ করতে হবে। প্রথমতঃ আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ 'মুসলিম' সংস্কৃতির উদ্গাতা হিসেবে পরিচিত আলকিন্দি, ইবনে ফারাবী, ইবনে সিনা এবং ইবনে রুশদ প্রাচীন গ্রীক দর্শনের আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা দেয়ার কারণে তাদের যুগের প্রখ্যাত আলেমদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের খ্যাতি ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলিম বিশ্বে তাদের কোন প্রভাব ছিল না। পশ্চিম দেশীয় প্রাচ্য গবেষকদের দ্বারা নতুন করে পরিচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে তাদের নামগন্ধও ছিল না।

তথাকথিত 'মুসলিম' দর্শন সক্রেটিস, প্ল্যাটো এবং এরিষ্টটলেরই শিক্ষা, ইসলামের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। বেশ কয়েক শতক ধরে মুসলিম বিশ্বে উন্নতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞান এবং গণিত শাস্ত্রের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, মুসলিম নামধারী অধিকাংশ বিজ্ঞানী এবং গণিত শাস্ত্রবিদই মুতাজিলা ঐতিহ্যের অনুসারী। যদিও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাদের সাফল্য গ্রীক এবং রোমের প্রাচীন দর্শনেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য এ কথার অর্থ এ নয় যে, ইসলাম ঐতিহ্যগতভাবে বিজ্ঞান গবেষণার বিরোধী। এর অর্থ হচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ধর্ম বিরোধী মূল্যবোধের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। এটা এইরূপ হওয়া উচিৎ ছিল না, কিন্তু হয়ে গেছে।

আমাদের মহান মুজাদ্দিদগণ মুতাজিলাদের দর্শন প্রত্যাখ্যান করলেও পদার্থ বিজ্ঞানে তাদের সত্যিকার অবদানকে অস্বীকার করেননি।

মুসলিম বিজ্ঞানী এমনকি আমাদের শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদগণও বিজ্ঞানকে গ্রীক দর্শনমুক্ত করে কোরআনের ভিত্তির উপর স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে বিজ্ঞান ইসলামের শত্রুদের হাতে চলে গেছে এবং মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো সুফীবাদ এবং ধর্মতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছেন। এই সুযোগে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ তার উন্নত প্রযৌক্তিক সমরাস্ত্রের দ্বারা মুসলমানদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার ও প্রভুত্ব করার সুযোগ পেয়েছে।

আমাদের পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিকদেরকে এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। রোমান্টিকতা ও স্বেচ্ছাচারী চিন্তায় কোন লাভ নেই। অতীতে মুসলিম সংস্কৃতিতে যেসব প্রাচীন ধ্যান-ধারণা অনুপ্রবেশ করেছে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কারণ এখানকার ধর্মবিরোধী শক্তির মতই এগুলো ইসলামের সঙ্গে আপোষহীন। শুধুমাত্র বস্তুবাদী মেধা ও পার্থিব সাফল্য না দেখে আমাদেরকে ধর্মনিষ্ঠার বিচারে যারা শ্রেষ্ঠ তাদের কাছ থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা নিতে হবে।

ধর্মীয় মতবাদকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করেই 'প্রগতির' দর্শনের কাছে তাকে সমর্পণ করা হয়েছে এবং 'প্রগতির' দর্শনই সার্বজনীনভাবে গৃহীত হয়েছে। এই মতবাদের প্রবক্তাদের ধারণা হচ্ছে বিবর্তনবাদ ইতিহাসের অপরিবর্তনীয় আইন। এই কারণে মানব জাতির অব্যাহত অগ্রগতিকে সামগ্রিক বস্তুগত সাফল্যের বিচারে শুধুমাত্র প্রশংসনীয় নয় বরং অনিবার্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়। OHIO-র হিব্রু ইউনিয়ন কলেজের ইহুদী ইতিহাসের অধ্যাপক Ellis Rivkin বলেন : ইহুদীবাদের অগ্রগতি একটি সাধারণ ধারণাই বদ্ধমূল করে যে, কোন মতবাদ তা যতই ঐশী বলে দাবী করা হোক পরিবর্তিত, উন্নয়নশীল ও অভিনব বিশ্বে যথাযথ থাকতে পারে না। আমাদের আধুনিকতাবাদীরা সর্বান্তকরণে ইসলামের বেলায়ও তা সত্য মনে করেন।

'প্রগতিবাদের' দর্শন নিম্নোক্ত অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে–

(১) চার্লস ডারউইনের মতবাদ কোন প্রকার প্রশ্ন ব্যতিরেকে গ্রহণ। নিম্নশ্রেণীর খুবই ক্ষুদ্র কীট থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ জন্মলাভ করেছে এই ধারণা বদ্ধমূল করে নেয়ার পর মানব দেহের ক্রমবিবর্তনেও বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়,

(২) ডারউইনের জীবতাত্ত্বিক মতবাদ মানব সমাজের বেলায়ও গ্রহণ করা হয়েছে,

(৩) অতএব আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করা বিবর্তনের আইনকে অস্বীকার করার সামিল। প্রগতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে ধরে নেয়া হয়েছে। নিম্ন ও আদিম সংস্কৃতি থেকে অত্যাধুনিক সংস্কৃতিতে উত্তরণ শুধুমাত্র আকাঙ্খিত নয় বরং প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় আইন। সকল পরিবর্তন যখন প্রগতির পথে একধাপ অগ্রগতি সুতরাং নতুনটাই ভাল এবং পুরাতনটা সমর্থন করার মানে আদিমতায় ফিরে যাওয়া,

(৪) আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঐশীভিত্তিক সকল ধর্মকে বাতিল করেছে এবং অতীন্দ্রিয় মূল্যবোধকে সেকেলে আখ্যায়িত করেছে। যে সমাজ সকল সময় তাদের যাবতীয় কাজকে ঐশী আইনের দ্বারা পরিচালিত করে সে

সমাজের সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব অনিবার্য, কারণ পরিবর্তন ছাড়া প্রগতি অসম্ভব।

প্রগতিবাদ অপশ্চিমী জাতিসমূহকে হতাশ করার জন্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক হাতিয়ার দ্বারা এই প্রচারণাকেই বদ্ধমূল করেছে যে, পশ্চিমা সাংস্কৃতিরই ভবিষ্যৎ রয়েছে এবং একে প্রতিহত করার সকল প্রচেষ্টা দুরাশা মাত্র।

প্রগতিবাদ যখন পরিবর্তনকে পূজা করার আহ্বান জানিয়ে থাকে তার অর্থ হচ্ছে কোন কিছুই স্থানীয় নয় সেটা চারিত্রিক, নৈতিক বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যা-ই হোক না কেন, কোন পদ্ধতি যদি ঐশী ভিত্তিক হওয়ার কারণে স্থায়িত্ব বা অবিনশ্বরতা দাবী করে থাকে তবে তা তার অভ্যুদয়ের একটা নির্দিষ্ট সময় বা কালের জন্যে। পরবর্তীকালে তা সেকেলে হয়ে যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ইসলামের ইতিহাসের বিকৃতির চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনী বার্তা ইতিহাসে আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ হয়ে গেছে, কারণ মুহাম্মদ (সা) শেষ নবী, তার পর আর কোন পরিপূর্ণতা আশা করা যায় না। অতএব ইতিহাসকে হয় মুহাম্মদকে অতিক্রম করতে হবে নতুবা তার বক্তব্য অনুসারে চলতে হবে। ইসলামী মতে অতীতের মধ্যে পরিপূর্ণতা চাইতে হবে, এখনকার সকল কাজ অতীতের আলোকে বিচার করতে হবে। (Ibid P-16) প্রগতিবাদীরা বলে থাকেন বর্তমান সমাজ নবীর সময়ের সঙ্গে কোনদিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অতএব ইসলাম যুগের অনুপযোগী। আমাদের শরিয়তের বিধান আধুনিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন, ফলে আজকের সমস্যার কোন সমাধান তাতে পাওয়া যাবে না।

প্রগতিবাদী মূল্যবোধের পরিণতি হচ্ছে– স্থিতিশীল বিশ্বে একজনের পরিবেশও স্থিতিশীল থাকে। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে পরিবেশ এবং বন্ধুর সীমাহীন ব্যত্যয় ঘটে। এসব পরিবর্তনের মুখে পুরুষ বা নারীরও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। তাদের মনোভাব এবং ইচ্ছা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। এ বছরের গভীর বিশ্বাস আগামী বছর তামাসায় পরিণত হয়। যার প্রতি আজ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা রয়েছে তা কাল পদদলিত হয়।*

* A Study of Modern American Suberb, Richard E. Gordon, Katherin K. Gordon and Max Gunther Dell Publishing Company. New York. 1960 P-114.

অধ্যাপক Wilfred Cantwell Smith-এর মতে একজন 'প্রগতিবাদী' সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন অপরদিকে একজন 'প্রতিক্রিয়াশীল 'প্রগতি'কে পরিহার করার জন্যে শুধু এর বিরোধিতাই করে না উপরন্তু পরিবর্তনকে ঠেকানোর জন্যে পূর্বেকার সামাজিক বিধানকে সংস্কারের প্রচেষ্টা চালায়। নতুন সমাজে প্রবেশ না করে আদিম সমাজকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে। এ মতানুসারে যারা ইসলামী সমাজকে আঁকড়ে থাকতে চায় তারা 'প্রতিক্রিয়াশীল'।

আমরা যারা ইসলামকে চাই, বিরোধীদের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায়িত হওয়ায় তাদের ভীত হওয়া উচিৎ নয়। একথা আমাদের বোঝা উচিৎ এই আখ্যা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না বরং ইসলামকে 'যৌক্তিক' 'আধুনিক' 'বৈজ্ঞানিক' 'গতিশীল' 'উদার' ও 'প্রগতিশীল' করে অমুসলিমদের তুষ্ট করার চেষ্টাই আমাদের জন্যে ক্ষতিকর। বস্তুবাদী আদর্শের ছত্রছায়ায় ইসলামকে বর্তমান যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টা আত্মঘাতী। কোরআনও সুন্নার প্রতি আমাদের নিষ্ঠার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হলে আমাদেরও পাল্টা প্রশ্ন রাখা উচিৎ যে,সেখানে অন্যায় কোথায়?

আধুনিকতা সমাজের জন্যে ও ব্যক্তি মানুষের জন্যে অকল্যাণকর এই কথা বলার সৎসাহস আমাদের অর্জন করতে হবে। ইসলাম অতীতের, বর্তমানের বা ভবিষ্যতের নয় বরং সকল যুগের। খারাপ বা ভাল সময়, স্থান ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়। খারাপ খারাপই এবং ভাল ভালই। ইসলামের স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবন পদ্ধতিতে আমরা সন্তুষ্ট। কোন মানব রচিত আদর্শের সঙ্গে তাকে তুলনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

পাঠকদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিৎ যে, ইসলামের আত্মরক্ষামূলক ব্যাখ্যা কিভাবে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ধ্বংস ডেকে আনছে। যতই আমরা এ পথে বাড়ব ততই আমরা দুর্বল হবো।

বলা হয়ে থাকে যে, এখন ইসলামের সামাজিক আইনের পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু যতদিন আমরা ইসলামের নৈতিক ও ধর্মীয় আইন কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করব না, ততদিন ইসলামের সামাজিক আইনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আশা করা যায় না। অতএব, আমরা বিচার করারও

ক্ষমতা রাখি না যে, ইসলামের সামাজিক আইন কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে বা আদৌ পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা। আমাদের ইজতেহাদের আকাঙ্খা ইসলামের প্রতি ভালবাসা প্রসূত নয়। এটা তার প্রতি বদ্ধমূল ঘৃণা এবং অন্য আদর্শের প্রতি ভালবাসার ফল। এর লক্ষ্য ইসলামের সত্যিকার ভিত্তি আবিষ্কার বা ব্যাখ্যা নয় বরং ইসলামকে অন্য আদর্শের কাছাকাছি আনার জন্যে এবং সেসব আদর্শের অনুরাগীদের সন্তুষ্টির জন্যে। এটা সত্যিকার ইজতিহাদ নয়, শরীয়ত থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেও এর প্রকাশ ঘটেনি বরং অন্যান্য আদর্শ থেকে যত বেশী সম্ভব ইসলামের বিকল্প খোঁজ করাই এর লক্ষ্য।

পশ্চিমা সভ্যতা এবং তার সকল উপায়-উপকরণের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের সাহস না থাকলে আমাদের পক্ষে ইসলামী পুনর্জাগরণ অসম্ভব। কোন মানুষই যেমন এক সঙ্গে দুই প্রভুর গোলামী করতে পারে না, ঠিক তেমনি একই সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধী দুটি আদর্শের অনুসরণ একজন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। তাকে দুটির যে কোন একটি বাছাই করতে হবে। পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ দৈহিক বিচ্ছিন্নতা নয় বরং পূর্ণ নৈতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক স্বাধীনতা। ইসলামকে বিদেশী মাপকাঠিতে ব্যাখ্যাদান চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে আমাদেরকে এই স্বাধীনতা প্রদর্শন করতে হবে। কোন অমুসলমানের পছন্দ বা অপছন্দের তোয়াক্কা না করে আমাদেরকে নির্ভেজাল ইসলামের হেফাজতের জন্যে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে।

আমাদেরকে এটা অনুধাবন করতে হবে যে, কোন অমুসলমানের দেয়া ইসলাম সম্পর্কিত ব্যাখ্যা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ যে মূল্যবোধের মাপকাঠিতে সে বিচার করে থাকে তা আমাদের নয়। একজন হিন্দু হিন্দু মন নিয়ে ইসলামকে বিচার করতে পারে, বৌদ্ধ বৌদ্ধ মন, ইহুদী ইহুদী মন, খ্রীষ্টান খ্রীষ্টান মন, অজ্ঞেয় মানবতাবাদী উদার সমাজতন্ত্র এবং কম্যুনিষ্ট দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শন দিয়ে ইসলামকে বিচার করতে পারে। নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হওয়া মনস্তাত্ত্বিকভাবে অসম্ভব। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্যকে বিচার করে থাকে। ইসলামের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যার সূত্র কোনটি ?

সমসাময়িক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব (১৭০০-১৭৮৭) বিশ্বব্যাপী যে ইসলামী রেনেসাঁর ভিত্তি স্থাপন করেছেন তাই প্রকৃত ভিত্তি। নির্ভেজাল ইসলামের বাস্তবায়নের জন্যে তিনি

আত্মোৎসর্গ করেছেন। ওহাবী আন্দোলনের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মোন্মাদ বলে চীৎকার করে থাকেন তাঁদের পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের বোঝা উচিৎ যে, তাঁরা ডারউইনের বিবর্তনবাদের উপর ভিত্তিকৃত পশ্চিমী বস্তুবাদী চশমা দিয়ে ইতিহাসকে দেখছেন।

ইসলাম পার্থিব প্রগতি এবং পশ্চাৎগতি দিয়ে ইতিহাসের বিচার করে না বরং অতীন্দ্রিয় ভাল এবং মন্দের আলোকে বিচার করে। সত্য অবিনশ্বর, ঐশী এবং চিরন্তন, বিবর্তনবাদী বা মানবরচিত নয়, সময় স্থান বা পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধও নয়। ইতিহাসের কোরআন ভিত্তিক ধারণায় আদম (আ)-ই প্রথম মানুষ এবং সত্যিকার আল্লাহর নবী, নির্ভেজাল একাত্মবাদী মুসলমান। ডারউইনের ব্যাখ্যাকৃত ইতিহাস অনুসারে আদম (আ) ছিলেন আধা-বানর, গুহায় বসবাসকারী পশুর মত নগ্ন, অসভ্য প্রাণী। বৈপরিত্য এতই সুস্পষ্ট যে এর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা কেন বিশ্বজয় করলো ? আমরা মুসলমানরা ধরে নিয়েছি যে, পরাজিত হওয়ার কারণে আমরা সবক্ষেত্রেই নিকৃষ্টতর। যদিও এই মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং বোধগম্য কিন্তু এর সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা যে পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে এতে তার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কোন প্রেরণা নেই,কিন্তু সম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা, সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও আনন্দ লাভের অদম্য সংকল্পই তাকে এ সাফল্য দিয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে বাকী সবকিছুই বিসর্জন দেয়া হয়েছে। অপর কথায় পশ্চিমা জগত কি চায় তা জানতো এবং তা অর্জনের জন্যে কোন প্রচেষ্টাই তারা বাকী রাখেনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভবিষ্যৎ জয়ের আত্মবিশ্বাস। আমরা মুসলমানরা যদি ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বে আত্মবিশ্বাসী হই তা বাস্তবায়নের জন্যে এক মন এক ধ্যানে আত্মনিয়োগ করি, কোন কিছুই আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইসলাম নয়, আমাদেরকেই পরিবর্তন সাধন করতে হবে। সাবান যেমন কাপড় পরিষ্কার করে আমরা তেমনি অপবিত্র অবস্থায় ইসলামে প্রবেশ করি এবং সুশৃংখল ও পরিষ্কার হয়ে তার থেকে বের হই।

সমাপ্ত

মরিয়ম জামিলা।

লেখিকা একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান। তার পূর্ব নাম ছিলো মার্গারেট মারকিউস। ইসলামের শ্বাশত আবেদনে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর নিজ ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। দশ বছর বয়স থেকেই ইসলামের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। তখন তিনি ইহুদীদের রবিবাসরীয় স্কুলের ছাত্রী। বয়সন্ধিকাল পর্যন্ত তিনি মানবতাবাদী দর্শনে প্রভাবিত ছিলেন। বুদ্ধি পরিপক্ক হওয়ার পর তিনি আর নাস্তিক্যবাদী আদর্শে বিশ্বাস রাখতে না পেরে ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। প্রথমে বাহাইদের সাথে কাজ শুরু করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে তিনি আলজেরিয়ার মরহুম শেখ ইবরাহীম, ওয়াশিংটনের ডঃ মাহমুদ এফ হোবাল্লা, প্যারিসের ডঃ হামিদুল্লাহ, জেনেভার ডঃ সৈয়দ রমজান এবং পাকিস্তানের মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সাথে যোগাযোগ করেন।

অতপর ১৯৬১ সালে ইসলামের সুমহান আদর্শ গ্রহন করে মুসলমান হয়ে মরিয়ম জামিলা নাম ধারণ করেন। মরিয়ম জামিলা তাঁর জীবনের মিশন হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করেন। এ জন্যে তাঁর জন্মভূমি আমেরিকা ত্যাগ করে পাকিস্তান চলে যান ১৯৬১ সালে। ঐ বছরই লাহোরের একজন মুসলমানকে বিয়ে করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে নিরলসভাবে কাজ করার ইচ্ছা এবং কাজের সাথে জীবনের সমন্বয় থাকায় মরিয়ম জামিলার বইয়ের আবেদন হৃদয়স্পর্শী। লেখিকার মূল বক্তব্য Either accept Islam in to to or keep it aside, Islam admits no compromise.

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি ভারত উপমহাদেশ, তুরস্ক ও আরব জগতের মুসলিম নেতা ও পণ্ডিতদের কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন এ গ্রন্থে।

আহসান পাবলিকেশন

মগবাজার বাংলাবাজার কাঁটাবন

ISBN : 984-32-1013-6